গোরুমারায় ফের টলিউড!

শিশু পাচার কিস্‌সা অন্ধকার ডুয়ার্সের জানালা খুলে দিল?

কম মজুরির জন্য চা-শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে পাড়ি

মুখোমুখি সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়

এখন ডুয়ার্স

১৬-৩১ মার্চ ২০১৭। ১২ টাকা

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

কলকাতা বইমেলায় 'এখন ডুয়ার্স'-এর বই

স্টল নং ১২৮

পর্যটনের বই

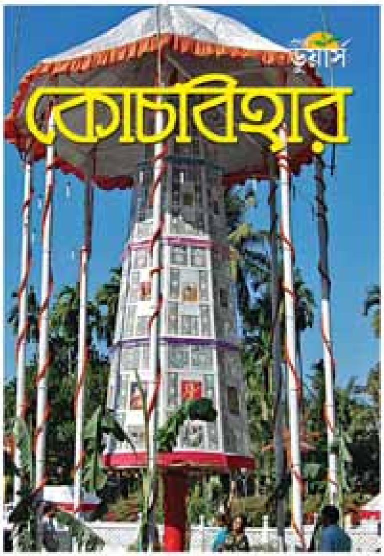

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

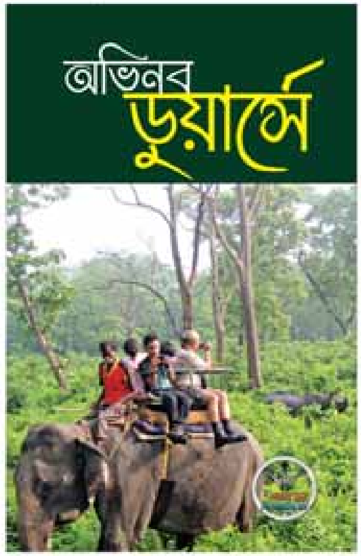

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

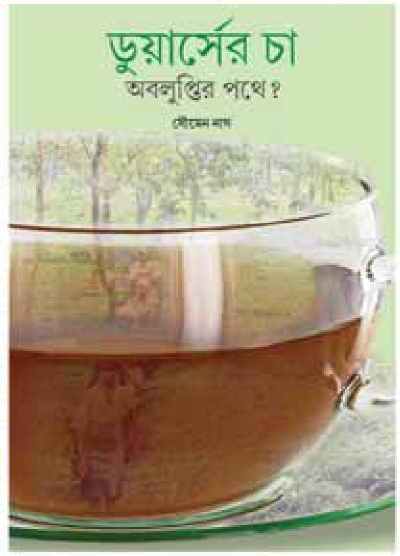

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

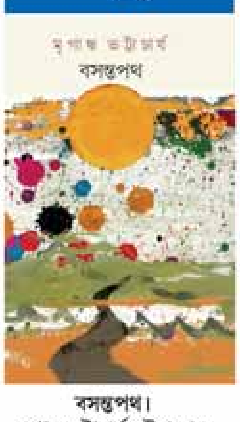

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

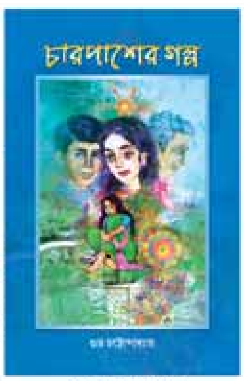

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

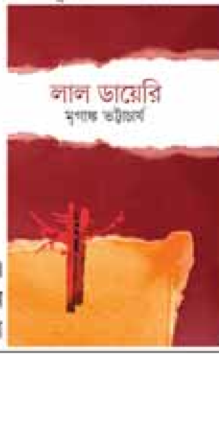

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান | আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

অন্যান্য শহরে বইয়ের প্রাপ্তিস্থান জানতে ফোন করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা। শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

ছ'মাসের এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

তৃতীয় বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৬-৩১ মার্চ ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স
ডুয়ার্স মুখ ঢেকেছে লজ্জায় ৪

দূরবিন
শিশু পাচার বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ৭

শিশু পাচার কিস্‌সা ১০

মজুরি কম তাই চা-শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে পাড়ি দেবার প্রবণতা বাড়ছে ১৪

এই অল্প দিনেই বুঝেছি এবার কাজ করার সুযোগ মিলবে প্রচুর ১৮

গোরুমারায় ফের টলিউড! ২২

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স ৩৬

ডুয়ার্সের ডায়েরি ৩৮

পাঠকের চিঠি ৩৯

নিয়মিত বিভাগ
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ২৫
খুচরো ডুয়ার্স ৪১
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৮
লাল চন্দন নীল ছবি ৩১
তরাই উৎরাই ৩৪

শ্রীমতী ডুয়ার্স
আজকের শ্রীমতী ২৬
ডুয়ার্সের ডিশ ২৬

প্রচ্ছদের ছবি তুলেছেন **স্যান্ডি আচার্য**

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকের ডুয়ার্স

ডুয়ার্স মুখ ঢেকেছে লজ্জায়

সেদিন বিয়েবাড়িতে পরিচিত এক ভদ্রমহিলা অপ্রস্তুতের একশেষ। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে এক ভদ্রলোক রসিকতা করে বললেন, 'আপনার নাম নিয়ে এখন বিপুল হইচই। সিআইডি পর্যন্ত আপনার নামধারী একজনকে ধরার জন্য ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল আমাদের সাদামাটা মফস্‌সল শহরে। টিভিতে চব্বিশ ঘণ্টা চর্চা হচ্ছে আপনার নামের একজনকে নিয়ে।' ভদ্রলোক হেসে যোগ করেছিলেন, 'তবে আপনি অবশ্য "তিনি" নন!' ভদ্রমহিলা কাষ্ঠহাসি হেসে বলেছিলেন, 'ভাগ্যিস!'

আসলে শিশু পাচার সংক্রান্ত মারাত্মক বিষয়টি এমনভাবে সমস্ত ডুয়ার্সকে নাড়া দিয়েছে যে, নেমন্তন্নবাড়ির সাড়ম্বর আয়োজনও আমজনতার মন থেকে আতঙ্ক দূর করতে পারছে না। বাঙালির বারোমাস্যায় ভাইরাল হয়েছিল সেই ছবি। আঁতকে উঠেছিল মানুষ। পাচারকারীদের শরীরে কি মানুষের রক্ত বইছে! যারা এমন ঘৃণ্য কাজ দিনের পর দিন ধরে করতে পারে, তাদের কি আমরা 'সাইকো' বলব? রবিনসন স্ট্রিটের পার্থ দে বা হাল আমলের উদয়ন দাসের সঙ্গে কি এক পঙ্‌ক্তিতে বসানো যায় এদের?

মনোবিজ্ঞান নিয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমে ফ্রয়েড সাহেবের কথা বলতে হয়। ফ্রয়েড বলেছিলেন, 'Hate, as a relation to object, is older than love… from the narcissistic ego's primordial repudiation of the external world with its outpouring of stimuli.' আসলে বিপন্ন শৈশব এই মানসিক জটিলতার একটা বড় কারণ। সেখান থেকে কারও কারও মধ্যে সমাজকে ঘৃণা করার মানসিকতা জন্ম নেয় চেতনায়। আশৈশব সমগ্র সত্তার মধ্যে লালন

ফেলুদা আর ব্যোমকেশ বক্সীর আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল ইদানীং। তবুও রহস্যের পেয়ালায় রোমাঞ্চ কম পড়েছিল। এবার দেখা গেল, কল্পজগৎকে মাটিতে আছড়ে ফেলে আমাদের আপাদমস্তক শিহরিত করল নিখাদ বাস্তব। ডুয়ার্স জুড়ে বিছিয়ে থাকা শিশু পাচারচক্রের আমূল ধরে টান দিল গোয়েন্দা বিভাগ।

কিছুদিন আগেই টিভিতে ক্লিপিং দেখে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। যেভাবে আপেল-আঙুর বাক্সবন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়, সেভাবে বিস্কুটের বাক্সে পাচার হত সদ্যোজাত মানবশিশু। সোশ্যাল মিডিয়ায় করা ঘৃণা তাড়িত করে এই ধরনের মানুষদের। কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই প্রশ্ন জাগে, যারা হোম চালাচ্ছিল বেআইনিভাবে, শিশু বিক্রির মতো ঘৃণ্য কাজ করে আসছিল দিনের পর দিন, তাদের শৈশব ও কৈশোর কি সত্যিই বিপন্ন ছিল? এই সমাজ কি অনুভূতির সহজ পাঠ এদের শেখায়নি? নাকি যেভাবে জিনের মধ্যে গোপনে ঘাপটি মেরে বসে থাকে ক্যানসারের বীজ, ঠিক তেমনিভাবে এদের মধ্যে সমাজ বপন করে দিয়েছে ভোগবাদ?

আমাদের সকলের মেরুদাঁড়া ভেঙে দিচ্ছে ভোগবাদ, যা এই নতুন শতকের

কী বলবেন এই পাচারকারীদের? এরা প্রকাশ্যে দিনের আলোয় খুন করেছে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে। গর্ভবতী মায়েরা প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে নার্সিং হোমে এসেছেন। কিন্তু ডাক্তার তাঁদের সরল আস্থায় কুঠার দিয়ে আঘাত করেছে। অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে। প্রসব হওয়া সন্তানকে মৃত প্রতিপন্ন করে মোটা টাকার বিনিময়ে তুলে দিয়েছে অন্যের হাতে। রক্তের সম্পর্কের কোনও মূল্য নেই এদের কাছে।

সবচাইতে বড় অভিশাপ। মানবিকতা ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে অর্থের পিছনে ছুটছে সকলে। চাই, আরও চাই। এই পৃথিবীর যা কিছু ভোগ্যপণ্য আছে— সব চাই। পরজন্মে বিশ্বাস নেই, যা চাই, এই জীবনেই চাই। মানবিক বোধ জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষ ছুটে চলেছে অন্ধকার গোলকধাঁধা দিয়ে। নিজের লাভের জন্য খুন করছে রাজনৈতিক নেতা। ঘুষ নিচ্ছে আমলারা। মৃত রোগীকে ভেন্টিলেশনে রেখে বিল বাড়াচ্ছে নার্সিং হোম। ইউএসজি করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে গর্ভপাত করছেন চিকিৎসক। নামতে নামতে এ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা?

কাম্যুর 'দ্য মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং' কাহিনিতে মার্থা নামে একটি মেয়ে ছিল। সরাইখানায় ধনী আগন্তুক এলে সে মায়ের সঙ্গে মিলে তাকে খুন করে ফেলে দিত নদীর জলে। কেননা তার অর্থ চাই। সে বিত্তশালী হতে চায়। একদিন এভাবেই সে খুন করে এক যুবককে। নিয়তির ফেরে জানা যায়, এই যুবকই ছিল তার হারানো ভাই। এ কথা জানার পর মার্থার মা অনুতাপে মৃত্যুর পথ ধরে। কিন্তু মার্থা তখনও নির্বিকার। ঠিক একই ভাবলেশহীনতা এখন আমাদের সকলের মধ্যে।

মানুষের মন এক গহিন অরণ্য। আলো-আঁধারির জাফরি দিয়ে ঘেরা সেই মনভূমির রহস্য এখনও আমাদের অজ্ঞাত। দিদি দেবযানীর প্রতি অগাধ ভালবাসা, দিদিকে সারাজীবন আঁকড়ে ধরতে গিয়ে পার্থ অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। একটি মানুষ দু'টি পোষ্যের মৃতদেহ নিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বন্ধ ঘরের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছেন দিনের পর দিন। মনোবিদের কথায়, এই অসুস্থতা বিরলতম। সাইকোসিসের ক্লাসিক উদাহরণ। উদয়ন দাসের ঘটনা অবশ্য আলাদা। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। সেই টাকা জোগাড় করতে গিয়ে সে সরিয়ে দিয়েছে নিজের মা-বাবাকে। খুন করেছিল প্রিয় বান্ধবীকে।

ঠিক কতটা পথ পেরলে কারও ব্যাবহারিক আচরণ অস্বাভাবিক বা বৈকল্যের পর্যায়ভুক্ত হবে তা তর্কের বিষয়। কিন্তু ছাপোষা কোনও মানুষের দিনের পর দিন ধরে এমন নৃশংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের ক্রমাগত বিস্মিত করে তোলে। আন্দাজ করা যায়, অনুভূতির কোমল জায়গাগুলো এদের কাছে কী পরিমাণ ঊষর। স্বাভাবিক মানুষের মনে যেভাবে দয়া, মায়া, মমতা, করুণা বা সহমর্মিতার উৎসার ঘটে, তার বিন্দুমাত্র এদের মধ্যে দেখা যায় না।

কী বলবেন এই পাচারকারীদের? এরা প্রকাশ্যে দিনের আলোয় খুন করেছে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে। গর্ভবতী মায়েরা প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে নার্সিং হোমে এসেছেন। কিন্তু ডাক্তার তাঁদের সরল আস্থায় কুঠার দিয়ে আঘাত করেছে। অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে। প্রসব হওয়া সন্তানকে মৃত প্রতিপন্ন করে মোটা টাকার বিনিময়ে তুলে দিয়েছে অন্যের হাতে। রক্তের সম্পর্কের কোনও মূল্য নেই এদের কাছে। বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে নাড়ির সম্পর্ক, তাকে এরা মান্যতা দেয় না। এই চক্রে ধৃতদের মধ্যে মহিলা রয়েছে প্রচুর। মেয়েদের মধ্যে নাকি সহজাত মাতৃত্ব থাকে। তাহলে এই সমস্ত মহিলা এমন কাজ করল কী করে!

সদ্যোজাতকে দেখলেই আমাদের বাচ্চাগুলোকে আদর করতে ইচ্ছে করে। বাৎসল্যরসে পূর্ণ হয়ে ওঠে মন। সেই শিশুদের বাক্সবন্দি করে পাচার করা হচ্ছে টানা দুই দশক ধরে। ভাবা যায়! কলকাতা থেকে ঠাকুরপুকুর, মছলন্দপুর থেকে বাদুড়িয়া, জলপাইগুড়ি থেকে সুখিয়াপোখরি। হাতুড়ে ডাক্তার থেকে এমবিবিএস পাশ করা গাইনোকলজিস্ট। মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে এই পাচারচক্র।

শুধুই কি নিঃসন্তান দম্পতির কোল আলো করেছে এই সদ্যোজাত শিশুরা? পাচার হওয়া এই শিশুদের যে অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়নি, সে নিশ্চয়তা কোথায়? এই শিশুদের বড় করে তাদের প্রত্যঙ্গ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে চড়া দামে বিক্রি করা হয়নি, সে গ্যারান্টি কে দেবে? কে হলফ করে বলবে, এই শিশুদের বড় করে দেশ-বিদেশের যৌনপল্লিতে বিক্রি করা হয়নি? ভিক্ষাবৃত্তির কাজে লাগানো হয়নি?

গোয়েন্দারা বলছেন, অর্থের জন্যই পাচারকারীরা সদ্যোজাতদের নিয়ে মুনাফার কারবার খুলেছিল। গ্রাম বা শহরের স্বল্পশিক্ষিত

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

গোয়েন্দারা বলছেন, অর্থের জন্যই পাচারকারীরা সদ্যোজাতদের নিয়ে মুনাফার কারবার খুলেছিল। গ্রাম বা শহরের স্বল্পশিক্ষিত দম্পতিকে সন্তান প্রসবের পর ভুল বুঝিয়ে তাদের সন্তানকে দত্তক দিতে রাজি করানো হত। মৃত ভ্রূণ দেখিয়ে বলা হত, মৃত সন্তান জন্মেছে। কম খরচে সন্তান প্রসব করাতে গিয়েও এই চক্রের খপ্পরে পড়েছেন অনেক দম্পতি।

দম্পতিকে সন্তান প্রসবের পর ভুল বুঝিয়ে তাদের সন্তানকে দত্তক দিতে রাজি করানো হত। মৃত ভ্রূণ দেখিয়ে বলা হত, মৃত সন্তান জন্মেছে। কম খরচে সন্তান প্রসব করাতে গিয়েও এই চক্রের খপ্পরে পড়েছেন অনেক দম্পতি। সব ক্ষেত্রেই মৃত সন্তান প্রসব হয়েছে বলে সরিয়ে নেওয়া হত জীবন্ত সদ্যোজাতকে। কাগজকুড়ানি, ভবঘুরে, গৃহহীন মহিলাদের টার্গেট করত এই চক্র। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কয়েকদিন সেবাশুশ্রূষা করে সন্তান প্রসবের পর কিছু টাকা দিয়ে বাচ্চা নিয়ে নেয় পাচারকারীরা। বিয়ের আগে কোনও মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে তাদেরকেও মুনাফার টার্গেট করা হত।

পাচারচক্রের এপিসেন্টার ছড়িয়ে আছে কলকাতা থেকে ঠাকুরপুকুর, বাদুড়িয়া থেকে জলপাইগুড়ি— সর্বত্র। এই কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছে অনেকে। বলা হচ্ছে, এরা সুস্থ নয়। মানসিকভাবে সুস্থ কারও পক্ষে সদ্যোজাতদের নিয়ে কারবার করা সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যিই কি তা-ই? আসলে এরা সবাই অপরাধী। 'অ্যান্টিসোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার' বলে চালিয়ে দিলে এদের অপরাধকে লঘু করে দেখানো হবে। সত্যের অপলাপ হবে সে ক্ষেত্রে। আসলে অর্থের পিছনে ছুটতে গিয়ে এইসব অমানুষ মানবিকতা ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়েছে।

সংবাদপত্র পড়ে আমরা জানতে পেরেছি, দত্তক নেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রয়েছে এ দেশে। রয়েছে নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ 'সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটি' (কারা)। রাজ্যগুলিতে রয়েছে 'স্টেট অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটি' (সারা)। রাজ্য সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী এরাই দত্তক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। বিবাহিত দম্পতি ও এককভাবে কোনও মহিলা বা পুরুষ সন্তান দত্তক নিতে পারেন। কিন্তু একক পুরুষ কন্যাসন্তান দত্তক নিতে পারেন না। সারা-র ওয়েব পেজে ঢুকে কেয়ারিংস বিভাগের মাধ্যমে অনলাইন আবেদন করতে হয়। তাতে অনেক ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা সময় গড়িয়ে যায়। এই দীর্ঘসূত্রিতার রন্ধ্রপথেই ঢুকে পড়ে কালসাপ। মাথাচাড়া দেয় দালালচক্র। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এরা সন্তানলাভের ব্যবস্থা করে দেয়।

সন্তানের মুখ দেখতে না-পারা মানুষগুলো হত্যে দিয়ে পড়ে ছিলেন সন্তান দত্তক নিতে। সরকারি ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা এঁদের মধ্যে জন্ম দিয়েছিল হতাশা। এঁদের কাছে তখন ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল এই চক্রের লোকেরা। জেনে হোক বা অজ্ঞাতে, এই বাবা-মায়েরাও কিন্তু অপরাধ করেছেন। গোয়েন্দারা তদন্ত করে জেনেছেন, ফরসা শিশুপুত্রের জন্য ২ লক্ষ টাকা দাম নিত এই চক্র। শ্যামলা ছেলের জন্য দাম নিত দেড় লক্ষ। ফরসা মেয়েদের দর লাখের আশপাশে। কালো হলে ষাট-সত্তর হাজার। অর্থনীতির চাহিদা-জোগানের অঙ্ক অনুযায়ী মানবশিশুর দাম উঠত-নামত। তাহলে কী বলবেন এই ক্রেতাদের! ফরসা ছেলের জন্য এই হ্যাংলামো কি মানসিক অসুস্থতা নয়!

সমাজের গভীর অসুখ এখন। যারা সমাজে আর পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মিশে থেকে নিজেদের প্রবৃত্তি সংগোপনে লুকিয়ে রেখে শিশু পাচারের মতো ঘৃণ্য নারকীয় কাজ করতে পারে, তাদের মস্তিষ্ক সংগঠন, চিন্তাপ্রণালী, বোধ ও বুদ্ধির সমন্বয় আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে। এতদিন বোঝা যায়নি, এবার দেখা গেল, এই মারাত্মক ক্যানসার সমাজের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে সেই পচা ঘায়ের পুরোটা না হলেও বেশ কিছুটা অংশ ডুয়ার্স দেখতে পেল এতদিনে।

শিশু পাচার বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগান এবং সংলগ্ন রাষ্ট্র নেপালের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে নারী পাচার শিল্পের পাশাপাশি যে আরেকটি ভয়ংকর শিল্প চোখের আড়ালে তাদের শাখাপ্রশাখার জাল নানাভাবে ছড়িয়ে চলেছে তা খোদ জলপাইগুড়ি শহরের বুকে সমাজসেবার নামে হোমের শিশু পাচারের ছবিটি প্রকাশ না হয়ে পড়লে অজানাই থেকে যেত। এ যেন এক নব বিশ্বায়নের ধাক্কায় এক শিল্প থেকে আরেক শিল্পায়ন। নারী পাচার নিয়ে হইচই শুরু হওয়ায় এই শিল্পের ঝুঁকির যাত্রার সঙ্গে লাভের পরিমাণ আগের তুলনায় কম। কারণ এইসব মেয়ের মধ্যে কেউ কেউ আবার ভাগের অধিকার চায়, কারণ তারা বুঝতে এবং কথা বলতে জানে।

এবার তাই নজর পড়েছে আরেক দিকে। অবোধ ও অসহায় শিশু। এরা ব্যথা পেলে কাঁদে বটে, কথা বলতে জানে না। একবার পোঁটলার মধ্যে জড়াতে পারলেই কয়েক লক্ষ টাকার ব্যবসা। শুধু চুরির মাল নিয়েই তো শিল্প গড়ে ওঠে না। তাই শিশু চুরি করে পাচারের পাশাপাশি এই পাচারকারীরা এখন মানবশিশু চাষের যে ব্যবস্থা করে চলেছে, তারও হৃদয়বিদারক তথ্য এখন দিনের আলোতে উপস্থিত হচ্ছে।

দূরবিন

পশুপাখির বাজারে খোলা আকাশের নিচে ছোট খাঁচায় বন্দি কুকুর ছানাগুলি দেখে যারা পশুপ্রেমিক নয়, তাদের মনও অনেক সময় কেঁদে ওঠে। কেউ কেউ এদের মুক্ত করতে কিনে বাড়িতে এনে ধীরে ধীরে একসময় তাদের ভালবাসতে শুরু করে। এইসব খাঁচার কুকুর ছানার পরিবর্তে যদি সদ্যোজাত বা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের এমন বন্দি করে বিক্রির জন্য উপস্থিত করার দৃশ্য দেখা যায়, তবে কি আমরা নিজেদের মানবসমাজের সদস্য বলে দাবি করতে পারব?

রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর জলপাইগুড়ি শহরে তথাকথিত দুই শিশু হোমের দপ্তরে হানা দিয়ে একরকমভাবে প্যাকিং বাক্সে বন্দি শিশুদের উদ্ধার করেছে। এইসব শিশুকে মুদিখানার সামগ্রীর মতো প্যাকিং করে খরিদ্দারকে ডেলিভারি করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। কাছেই আরেকটি তথাকথিত হোম থেকে একই অবস্থায় ১৪টি শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের দরিদ্রতার সুযোগেই যে এখানে শিশু পাচারচক্র গড়ে উঠেছে তা নয়, এই পাচারের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়েছে এই রাজ্যসহ অন্যত্র। সমস্যাটা আজ আর কোনও স্থানীয় সমস্যা নয়। এর মোকাবিলায় তাই দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

শিশু পাচার নিয়ে ব্যবসার রমরমা

এ তো শুধু জলপাইগুড়ির ঘটনা নয়, সারা

রাজ্য তথা দেশ জুড়েই রয়েছে শিশু পাচারের ব্যবসা। সন্তানহীনদের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই অভাব পূরণের জন্য সন্তানকে দত্তক নেওয়ার চাহিদা। সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটি (সিএআরএ) যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাবে, ২০১৬ সালে দত্তক গ্রহণের জন্য আবেদনপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১২০০০-এরও বেশি। এদের মধ্যে ৩০১১টি শিশুকে দত্তক দেওয়া হয়ছে। এই সংস্থার ডিরেক্টর দীপক কুমার জানিয়েছেন, আইনি পথে দত্তক পাওয়ার আছে নানা আইনি জটিলতার পাশাপাশি দীর্ঘসূত্রিতা। ফলে, বহু মানুষ সহজ উপায় দালাল মারফত এই শিশু সংগ্রহ করার পথকে বেছে নিতে চাইছে। আর এই সুযোগেই গড়ে উঠছে সারা দেশ জুড়ে এই শিশু পাচারচক্রের বিশাল জাল। যে সমস্ত শিশু নিঃসন্তানদের ঘরে যায়, তাদের আইনি পথে না নিলে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে জন্ম শংসাপত্র পেশ করা বাধ্যতামূলক। সেই জাল সার্টিফিকেটের জন্য গড়ে উঠেছে আরেকটি চক্র। জানা যাচ্ছে, কোনও শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজন হলে কোনও প্রসবিনী মাতা ভাড়া দেওয়ার চক্রও গড়ে উঠছে অর্থাৎ শিশু পাচার হয়ে উঠেছে নানা শাখাপ্রশাখাসহ এক অবৈধ শিল্প।

এখানে শিশু পাচারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে আরেকটি ভয়াবহ অবৈধ কারবার। এই সমস্ত শিশুর কিডনি বা কর্নিয়া ইত্যাদির মতো অঙ্গগুলি এক শ্রেণির চিকিৎসকের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করে বার করে চড়া দামে ধনী পরিবারের সন্তানদের জন্য বিপুল দামে বিক্রি করা হয়। কয়েকটি হোম সংলগ্ন মাঠে গণকবরে এরকম অনেক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের পর এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছে।

সামনে ভগবানের বাণী, পিছনে অমৃতের সন্তানদের বধ্যভূমি

মানুষই পারে মনুষ্যত্বকে হত্যা করতে। তাই তো এক কথায় বলা যায়, প্রাণীজগতের হিংস্রতম প্রাণী মানুষ। অথচ এই মানুষের মধ্যে কী চরম বৈপরীত্য। এখানে এক মানুষ ঘোষণা করছে মানুষকে অমৃতস্য পুত্র বলে। এক মানুষ অন্য মানুষকে মুক্তির ঠিকানা দিতে রাজপুরীর ঐশ্বর্যকে হেলায় উপেক্ষা করে রাস্তার ধুলোয় বেরিয়ে পড়ে বোধি অর্থাৎ পরম জ্ঞানের অমৃত সুধা ও ভালবাসার টানে একে অপরকে কাছে

> শিশু পাচারের এই ব্যবসা আজ তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। থাইল্যান্ড থেকে একটা ভিডিয়ো উদ্ধার হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলি শিশুর মৃতদেহ। এদের দেহ থেকে কিডনি, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ অত্যন্ত নিপুণ অস্ত্রোপচার করে বার করা হয়েছে। এই সমস্ত শিশু কিন্তু সবাই থাইল্যান্ডের নয়। এদের চেহারা দেখে বোঝা যায়, এদের অনেকেই আলাদা আলাদা দেশের শিশু।

টানতে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'র ডাক দিয়ে। এক মানুষই পারে অপর মানুষকে মুক্তি খুঁজে দেওয়ার তাগিদে স্বেচ্ছায় অপর মানুষের হাতে কাঁটার মুকুটে বিদ্ধ হয়েও সেই হত্যাকারীদের জন্য প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে।

আজ শিশুদের নিয়ে যারা এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় রত, তারাও তো নামের পরিচয়ে মানুষ বলে চিহ্নিত। তাই কেবল একটা সংশয় মনকে আঘাত করে, ওইসব মানুষের আত্মত্যাগ কি তাহলে বিফলে যাবে?

পশ্চিমবাংলার ২৪ পরগনার ছোট্ট শহর বাদুড়িয়া। সেখানে এক নার্সিং হোমের নাম সোহান নার্সিং হোম অ্যান্ড পলিক্লিনিক। এখানকার গ্রামবাসীরা প্রায় সবাই মুসলমান। তাই হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতার কোনও নামমাহাত্ম্য এখানে কাজ করবে না। নার্সিং হোমের সামনে খোদাই করে লেখা 'নিরাশ আঁধারে খোদা... তুমি হে আশার পুর'। এই নার্সিং হোমটি এখনও আশপাশের এলাকায় মানবদরদি সংস্থা বলে পরিচিত। এরা অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ এবং অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব মোচনের কেন্দ্র বলে খ্যাত। এলাকার অধিবাসীরা প্রায় সবাই গরিব। এদের মহিলাদের জন্য এই ক্লিনিকটিই ভরসা। এর মালিক আসারুজ্জমান। নানা ধরনের 'সমাজসেবা'র কাজের স্থানীয়ভাবে সম্মাননীয়। রাজনৈতিক দলের অনেক নেতাই তার মুক্ত হস্তের বদান্যতার আকর্ষণে এখানে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন।

২০১৬ সালের ১৯ নভেম্বর গোয়েন্দা বিভাগের একটি দল এই নার্সিং হোমে হানা দিয়ে বসল। প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হল এখানকার ধাই নাজমা বিবিকে। সে-ই নিয়ে গেল তদন্তকারী দলকে নার্সিং হোমের ভিতরের একটি ঘরে। সেখানে তিনটি শিশু। সবারই বয়স এক বছরের নিচে। এদের দু'জনকে একটা বাক্সের মধ্যে মুদিখানার জিনিস যেমন খরিদ্দারের বাড়িতে পৌঁছে দেয়, তেমন করে প্যাক করা। অর্থাৎ এদের খরিদ্দার পাওয়া গিয়েছে। এই দুটো শিশুকে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। গোয়েন্দাদের অনুসন্ধানে তৃতীয় শিশুটির পিতা-মাতার খোঁজ পাওয়া গেল। এদের সূত্র ধরে উদ্ধার যে ১২টি শিশুকে গোয়েন্দারা উদ্ধার করেছিলেন, তাদের সবাই অপুষ্টি এবং নানা অসুখে আক্রান্ত। গোয়েন্দা দপ্তরের মতে, ইতিমধ্যেই বহু শিশু নানা জায়গায় পাচার হয়ে গিয়েছে।

প্রতিবেদনের শুরুতেই খাঁচায় রাখা কুকুর ছানাদের কথা উল্লেখ করাতে হয়ত কেউ ক্ষুব্ধ হতে পারেন মানবশিশুর সঙ্গে কুকুর ছানার তুলনা করা হয়েছে ভেবে। কিন্তু কুকুর ছানার ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার স্বার্থে খাঁচায় বন্দি কুকুর ছানাদের প্রতি যে যত্ন নেয়, এইসব পাচার হয়ে আসা শিশুর প্রতি সেই যত্নের সামান্যও পাচারকারীরা করে না। এর প্রমাণস্বরূপ, মছলন্দপুরে সুজিত দত্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পিছনের ফাঁকা জায়গার মাটিতে পুঁতে রাখা কয়েকটি শিশুর মৃতদেহের সন্ধান গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মীরা পেয়েছেন। এ ছাড়া কলকাতার কাছে একটা মাঠে পাওয়া গিয়েছে তিনটি শিশুর মৃতদেহ। গোয়েন্দাদের অনুমান, শিশুগুলিকে পাচার করার সময় এদের মৃত্যু ঘটলে এখানে ফেলে দেওয়া হয়।

শিশু অঙ্গ বিক্রির তথ্য হাতে

শিশু পাচারের এই ব্যবসা আজ তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। থাইল্যান্ড থেকে একটা ভিডিয়ো উদ্ধার হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলি শিশুর মৃতদেহ। এদের দেহ থেকে কিডনি, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ অত্যন্ত নিপুণ অস্ত্রোপচার করে বার করা হয়েছে। এই সমস্ত শিশু কিন্তু সবাই থাইল্যান্ডের নয়। এদের চেহারা দেখে বোঝা যায়, এদের অনেকেই আলাদা আলাদা দেশের শিশু।

বিদেশের দিকে যাবার আগে নিজের দেশের দিকেই তাকানো যাক। সরকারি তথ্যেই বলা হয়েছে, একমাত্র ২০১৩ সালেই

সারা দেশে শিশু পাচারের ঘটনার জন্য ১৩৬১টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। এই নথিভুক্ত সংখ্যার তুলনায় শিশু পাচারের অনথিভুক্ত সংখ্যা যে কয়েক গুণ তা অনুমান করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এক সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, গণিকালয়ে দেহব্যবসায় লিপ্ত মহিলাদের মধ্যে গর্ভধারণের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানকার মহিলাদের গর্ভধারণের প্রবণতা ছিল না। কারণ গর্ভধারণের কয়েক মাস পরেই তাদের চেহারায় যে পরিবর্তন ঘটে, তাতে তাদের প্রতি খরিদ্দারের চাহিদা কমে যায়। তাহলে এই ধরনের গর্ভধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? অথচ গণিকাপল্লিতে শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধিও পাচ্ছে না কেন?

এই সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, ওই সমস্ত শিশুর জন্মের পর ১০০০০-১৫০০০ টাকার বিনিময়ে কিনে নেওয়া হয়। পরে তিন লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে সুযোগ বুঝে আরও বেশি দামে বিভিন্ন মানুষকে বেআইনিভাবে নানা হোমের মারফত দত্তক হিসেবে এদের বিক্রি করা হয়।

আসাম-ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড-ছত্তিশগড় বা এই রাজ্যের দারিদ্রপীড়িত এলাকার মেয়েদের নানা কাজের প্রলোভন দেখিয়ে শহরের নানা জায়গায় আটকে রেখে শুধু যে যৌন ব্যবসায় লিপ্ত করতে বাধ্য করা হয় তা নয়, তাদের এই ধরনের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র রূপেও ব্যবহার করা হয়।

এখন শিশু পাচার ব্যবসায় গর্ভ ভাড়াও যুক্ত হচ্ছে

গর্ভধারণে অক্ষম দম্পতির হয়ে গর্ভ ভাড়া, যাকে বলা হয় 'সারোগেট মাদার' সেখানেও যুক্ত হচ্ছে এই শিশু পাচারের ব্যবসা। এ ক্ষেত্রে শিশুর দাম আগেভাগেই দরদাম করে নেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। এখানেও আবার সেই কুকুর ছানা বিক্রির সঙ্গে মানবশিশুর বিক্রির তুলনা অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও করতে হচ্ছে। কুকুর ছানার বাজারদর নির্ধারিত হয় তাদের গাত্রবর্ণ ও জাত, যাকে বলা হয় পেডিগ্রি, তার উপর। আর মানবশিশুর দাম নির্ধারিত হয় তার লিঙ্গ, গাত্রবর্ণ, শ্রেণি বা কার ঔরস, তার ভিত্তিতে। সেই বিবেচনায় শিশুর দাম হয় দেড় লক্ষ থেকে পনেরো লক্ষ টাকা। এমনকি এর চেয়েও বেশি দাম ওঠে। ছেলে সন্তানের দাম বহু ক্ষেত্রে কন্যাসন্তানের দ্বিগুণ হয়। বেশির ভাগ লোকের পছন্দ ফরসা সন্তান। তাই গর্ভধারণের জন্য যেমন ফরসা মহিলাদের প্রাপ্য হয় বেশি, তেমনই সেই মহিলার গর্ভের সন্তানদের দামও ওঠে বেশি।

মানুষ প্রাণীজগতের হিংস্রতম প্রাণী হলেও তার মধ্যে থাকে মানবিকতা, যা তাকে দেয় মনুষ্যত্ববোধ। ছাদহীন ফুটপাথে আশ্রিতা যুবতী অথবা মধ্যবয়স্কাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা তো প্রায়ই ঘটে। এই পাশবিক কামবৃত্তিতে সেই অসহায় মহিলার কোলে থাকা শিশুকে আছড়ে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না নরাধমরা।

জন্মগতভাবে ব্যাধিগ্রস্ত ও পঙ্গু শিশুসন্তানের বাজারদর নেই। এদের অনেকেরই জায়গা হয় মাটির তলায় অঙ্গ বিক্রির বাজারে অঙ্গ অস্ত্রোপচারের পর।

শিশুর জন্মের নথি দরকার। সেইসব অতি সহজে জোগাড় হয়ে যায় জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত হওয়া দপ্তরের সঙ্গে বন্দোবস্তের মাধ্যমে। হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশু চুরির খবর তো এখন সংবাদপত্রের পাতায় প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বহু ক্ষেত্রেই এই শিশু চুরি ঘটনার সঙ্গে হাসপাতালের কর্তাদের একাংশ যে জড়িত, সেটাও অজানা নয়। আরও ভয়ংকর ঘটনা হচ্ছে, মানুষের জীবন রক্ষার শপথ নেওয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের সেইসব মহান হিপোক্রিট, যাঁরা চিকিৎসাকে তাঁদের ব্রত বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরাই এই জঘন্য শিশু পাচারকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন।

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি শহরে হোমের নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আড়ালে শিশু পাচারের ঘটনার তদন্তে স্কুল শিক্ষিকা, নার্স ও কিছু চিকিৎসকের যুক্ত থাকার ঘটনা যেমন তদন্তে উঠে এসেছে, তেমনই এঁদের মাথার উপর কিছু রাজনৈতিক নেতার ছাতা ধরার তথ্যও প্রকাশ পেয়েছে। শোনা যায়, হিংস্র নেকড়েও নাকি অনেক সময় মানবশিশুকে তার মাতৃদুগ্ধ দিয়ে মায়ের মতো রক্ষা করে। মানুষ দ্রুত হিংস্র প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। শিশু পাচারের ঘটনাই তার প্রমাণ।

মানুষ প্রাণীজগতের হিংস্রতম প্রাণী হলেও তার মধ্যে থাকে মানবিকতা, যা তাকে দেয় মনুষ্যত্ববোধ। ছাদহীন ফুটপাথে আশ্রিতা যুবতী অথবা মধ্যবয়স্কাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা তো প্রায়ই ঘটে। এই পাশবিক কামবৃত্তিতে সেই অসহায় মহিলার কোলে থাকা শিশুকে আছড়ে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না নরাধমরা। এখন কিন্তু এই নারীদেহের থেকেও তার কোলের শিশুটা অনেক বেশি লোভনীয়। তার প্রমাণ, মহীশূরের রাজপথের ফুটপাথে শুয়ে থাকা ভিখারিনি পার্বতীর ১১ মাসের সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে গাড়িতে করে চলে যাওয়া। পার্বতী থানায় ছুটে গেলে এ দেশের পুলিশ ব্যতিক্রমী তৎপরতায় তার সন্তান উদ্ধার অভিযানে নেমে খুঁজে পায় এক বিরাট শিশু পাচার চক্র। জানতে পারে, নাশিমা নার্সিং হোমের সুপারভাইজর উষা ফ্রান্সিস এই চক্রের মাথার মণি।

তাই প্রশ্ন জাগে, কী করে বাঁচব আমরা? কী করে বাঁচাব আমাদের মনুষ্যত্বকে? নিজের ঘরের শিশুটির দিকে তাকালে এক ভয়ংকর অজানা আতঙ্কে বুক কেঁপে ওঠে। ওকে কি আগলে রাখতে পারব শিশু পাচারকারীর বিষাক্ত থাবার কবল থেকে?

সৌমেন নাগ

শিশু পাচার কিস্‌সা

ডুয়ার্সের অন্ধকার জগতের একটি জানালা খুলে গেল!

জলপাইগুড়ি জেলার হোম থেকে শিশু পাচারের ঘটনা সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। প্রথমে সিআইডি গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ির বিমলা শিশু গৃহ আর আশ্রয় হোমের প্রধান কর্ত্রী চন্দনা চক্রবর্তীকে। তারপর একে একে গ্রেপ্তার করা হয় চন্দনার ভাই মানস ভৌমিক, হোমের কর্মী সোনালি মণ্ডল, বিজেপি-র নেত্রী জুহি চৌধুরি, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি দুই জেলার চুক্তিভিত্তিক শিশুসুরক্ষা আধিকারিক মৃণাল ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী সস্মিতা ঘোষ এবং হোমের চিকিৎসক তথা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য ডাক্তার দেবাশিস চন্দকে। এই লেখা যখন লিখছি, তখনও পর্যন্ত এই ক'জনই গ্রেপ্তার হয়েছেন। তবে সিআইডি আরও অনেক নাম পেয়েছে। তদন্ত পুরোদমে চলছে বলে সিআইডি-র অফিসাররা জানিয়েছেন। ধৃতদের জেরা চালিয়ে সিআইডি আরও নাম পেয়েছে। নাম উঠে এসেছে বিজেপি-র সর্বভারতীয় এক নেতা ও অভিনেত্রীর নামও। তবে ধারাবাহিকভাবে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে গেলে আরও রহস্য উন্মোচিত হবে বলেই অনুমান করছেন সিআইডি-র অফিসাররা। ইতিমধ্যে সিআইডি হেপাজতে থেকেই জুহি চৌধুরির মতো অভিযুক্তরা সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন। আর ধৃত সস্মিতা ঘোষ তো এই ঘটনার জন্য পুলিশ প্রশাসনের সমালোচনাতেই মেতেছেন। তবে সিআইডি-র গোয়েন্দারা বলেছেন, দুই স্বামী-স্ত্রী বা দুই জেলার চুক্তিভিত্তিক শিশুসুরক্ষা আধিকারিকদের মদত ছাড়া এই শিশু পাচারচক্র মাথা তুলতে পারত না। আর চন্দনার হোম থেকে পাচারের পরিবর্তে কমিশনের টাকা ওই শিশুসুরক্ষা আধিকারিকদের পকেটেও এসেছে বলে গোয়েন্দারা জানিয়েছেন। তবে ঘটনা দিল্লিকেও নাড়া দিয়েছে। তাই দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের একটি দল মঙ্গলবার ৭ মার্চ জলপাইগুড়ি আসে। তাঁরা চন্দনার হোম ঘুরে দেখা থেকে শুরু করে অন্য হোমগুলো ঘুরে একটি রিপোর্ট দিল্লিতে জমা দেবেন বলে জানা গিয়েছে। মূলত সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স এজেন্সির হয়েই যশবন্ত জৈন ও প্রিয়াঙ্ক কানুনগোর নেতৃত্বে ওই দলটি জলপাইগুড়ি আসে। তাঁরা প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন হোমের অব্যবস্থা দেখে ক্ষোভই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ফুলের মতো যেসব শিশু রয়েছে, যারা কথা বলতেও জানে না, যাদের মনে প্রবেশ করেনি পৃথিবীর অপরাধ বা পাপগুলো, যাদের সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা হতে পারে না, সেই শিশুদের বিক্রি করে ব্যবসা? ফলে এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে ধিক্কার শুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশুগুলোকে নিয়ে যারা এই ব্যবসা করতে পারে, তারা কি মানুষের পর্যায়ে পড়ে? কিন্তু কীভাবে এই ব্যবসা হয় তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। এই প্রতিবেদক বিভিন্ন মহলে সত্য জানতে যোগাযোগ করেছে। সিআইডি-র আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের কর্তা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবীর সঙ্গেও কথা বলে কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

প্রথমেই আসা যাক শিশু ও নারী পাচার প্রসঙ্গে। একটা পাচার হয়ে আসছে বহুদিন

ধরে— দশ থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত শিশু-কিশোর ও মেয়েদের পাচার করা। সেই পাচারের বিরুদ্ধে সরকারের পরিকল্পনা হয়ে আসছে বহুদিন ধরে। নেওয়া হয়েছে অনেক প্রকল্প। সরকারি সাহায্যেই দেশ জুড়ে সেই পাচার ঠেকাতে অনেক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করছে। সেইসব স্বেচ্ছাসেবীর কথায়, পাচার হয় যেসব কারণে— ১) শিশুশ্রমিক প্রথা জিইয়ে রাখা। বহু স্থানে কারখানা, চা-দোকান, হোটেল চালাতে শিশুশ্রমিকের চাহিদা রয়েছে। তারা টাকা দিয়েই দশ-বারো বছরের বালকদের কিনে নেয়, যাতে তাদের দিয়ে কম অর্থ খরচ করে সব কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। আর সেইসব প্রতিষ্ঠানে শিশুশ্রমিক সরবরাহের জন্য পাচারকারীদের একটা গোষ্ঠী অনেকদিন ধরে সক্রিয়। ২) যৌন ব্যবসা। দশ-বারো থেকে আঠারো বছরের মেয়েদের তুলে এনে নিষিদ্ধপল্লিতে সরাসরি বিক্রি করে দেওয়া। সেখানে এইসব মেয়ের চাহিদা বেশি। তাদের বিনিময়ে বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি টাকার কারবার চলে। ৩) শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করে দেওয়া। কিডনি, চোখ, লিভারসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চাহিদা বিশ্ব জুড়ে। অনেক ধনবান ব্যক্তির মধ্যে কারও কারও সন্তানের কোনও অঙ্গ হয়ত নেই। তারা অঙ্গ কেনার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতেও প্রস্তুত। আর সেইসব অঙ্গ চলে আসে পাচার হওয়া শিশু-কিশোরদের শরীর থেকে।
৪) পাচার হওয়া শিশু-কিশোরদের অঙ্গহানি ঘটিয়ে তাদের রাস্তার মধ্যে ফেলে ভিক্ষা করানো। বড় বড় তীর্থস্থানে বা মেলাতে তাদের অঙ্গহানি দেখিয়ে আবেগের ভিক্ষে জোগাড় করা।

এইসব সংগঠিত পাচারচক্র বেশ শক্তিশালী। তাদের নেটওয়ার্ক বিশ্ব জুড়ে। এরা বহু ক্ষেত্রে মূলত গরিব পরিবারগুলোকেই বেছে নেয়। উত্তরবঙ্গের রুগ্‌ণ চা-বাগান ও তার আশপাশে এরকম নেটওয়ার্ক সক্রিয় বহুদিন ধরে। এদের নেটওয়ার্ক রয়েছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকাগুলোতেও। এরা গরিব ঘরের ছেলে বা মেয়েদের কাছে যাওয়ার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। তারা কখনও চাকরির টোপ, কখনও বিয়ের টোপ দেয়, অভাবী ঘরে সামান্য কিছু টাকা প্রথমে হাতে ধরিয়ে দেয়। তারপর সেই পরিবারের ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। তবে ইদানীং এ রাজ্যে 'কন্যাশ্রী'র মতো প্রকল্প এসেছে, শিশুশ্রম ঠেকাতেও অনেক প্রকল্প এসেছে। আইসিডিএস-এর অনেক প্রকল্প এসেছে। এতে অনেক পরিবার সচেতন হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী

ধৃত দার্জিলিঙের ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার মৃণাল ঘোষ

এখন সমস্যা তৈরি হচ্ছে ফেসবুক, হোয়াট্‌সঅ্যাপ নিয়ে। পাচারকারীরা অনেকে এখন ফেসবুকে সবকিছু গোপন রেখে মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছে। নানারকম টোপ দিচ্ছে। তারপর সেইসব মেয়েকে কোনও এক স্থানে দেখা করতে বলে তাদের তুলে নিয়ে পাচার করে দিচ্ছে। দার্জিলিং ও জলাপাইগুড়ি জেলা থেকেই এই পাচারের হার বেশি।

পাচারের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। ফলে সচেতনতা এসেছে অনেক। 'কন্যাশ্রী'র দৌলতে অনেক অভাবী পরিবার মেয়েদের বিয়ে দিতে চাইছে না। যেটার সুযোগ আগে নিত পাচারকারীরা। তা ছাড়া অনেকে আজকাল স্কুলেও আসছে। 'সবুজ সাথী'র দৌলতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা আজকাল স্কুলে নিয়মিত আসছে। ফলে সচেতনতা আরও দ্রুত তৈরি হচ্ছে। এখন সমস্যা তৈরি হচ্ছে ফেসবুক, হোয়াট্‌সঅ্যাপ নিয়ে। পাচারকারীরা অনেকে এখন ফেসবুকে সবকিছু গোপন রেখে মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছে। নানারকম টোপ দিচ্ছে। তারপর সেইসব মেয়েকে কোনও এক স্থানে দেখা করতে বলে তাদের তুলে নিয়ে পাচার করে দিচ্ছে। যদিও কোনও কোনও মহলের দাবি, ২০১২ সালের পর থেকে অনেক সরকারি প্রকল্প আসাতে পাচার অন্তত দশ থেকে কুড়ি শতাংশ কমেছে। যদিও দার্জিলিং ও জলাপাইগুড়ি জেলা থেকেই এই পাচারের হার বেশি। জলপাইগুড়ি থেকে বন্ধ চা-বাগান, দার্জিলিং জেলাতে নেপাল সীমান্তকে কাজে লাগিয়ে পাচারকারীরা সক্রিয় হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় আজকাল চাইল্ডলাইনের মতো ১০৯৮, বিভিন্ন পিকেটিং, স্টেশন, বাস স্ট্যান্ডে নজরদারি বাড়তে থাকায় সংগঠিত পাচারকারীরা অনেকটাই পিছু হটছে। স্কুলগুলোতে সচেতনতা শিবির হওয়াতেও অনেক কাজ হয়েছে। তবুও শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে চাইল্ডলাইনের এক হিসেব বলছে, মাসে তারা যে ৪০ থেকে ৪৫টি শিশু-কিশোরকে উদ্ধার করে, তার ৫ থেকে ১০ ভাগ পাচারকারীদের খপ্পরে পড়া। পাঁচ থেকে দশ ভাগ উদ্ধার হওয়া শিশু-কিশোর পাচারকারীদের কবল থেকে বাঁচতে পারলেও বাকি কত যে বাঁচতে পারছে না, তার কোনও হিসেবই নেই।

এ তো গেল দশ থেকে আঠারো বছর বয়সি শিশু-কিশোর-কিশোরীদের পাচারের পিছনে সংগঠিত অপরাধচক্রের ব্যবসার খবর। কিন্তু একেবারে সদ্যোজাত শিশু? খবর বলছে, দশ থেকে আঠারো পর্যন্ত পাচার নিয়ে ব্যস্ত থাকা পাচারকারীরা সদ্যোজাতদের পাচারের মতো কারবারে সেভাবে নাক গলাতে রাজি নয় বা তার পিছনে বিনিয়োগ করতে সেভাবে আগ্রহী নয়। কারণ— ১) সদ্যোজাত শিশু পাচারের কাজে অনেক ঝুঁকি রয়েছে। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ও প্রবল। কারণ, সদ্যোজাত শিশু পাচার করার সময় একজন করে মহিলা সঙ্গে রাখতে হবে। শিশুকে ঘন ঘন দুধ খাওয়াতে হবে। তার শরীর হঠাৎ হঠাৎ দ্রুত খারাপ হতে পারে। তারপর সেইসব দুধের শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করার মতো পরিবেশ বা চাহিদা তেমন নেই। ফলে এর পিছনে যা ঝক্কি, যা পরিশ্রম এবং বিনিয়োগ, তার থেকে দশ বছরের বেশি বয়সিদের পাচার করতে ঝক্কি অনেক কম।

তবে সদ্যোজাত শিশু পাচারের ঘটনা জলপাইগুড়িতে প্রকাশ্যে এল কীভাবে? খবর বলছে, সেটা ঠিক পাচার নয়। সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে থেকে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রর চোখে ধুলো দিয়ে হোম থেকে সদ্যোজাত অবলাদের মোটা টাকার বিনিময়ে নিঃসন্তানদের কাছে জাল কাগজপত্র তৈরির মাধ্যমে বিক্রি করা। বা ঘুরিয়ে বলা চলে, পাচার করা। একে কেউ কেউ 'বেআইনি দত্তক' বলছেন। আর এই কাজটিই রমরমিয়ে চলছিল জলপাইগুড়ির চন্দনা চক্রবর্তীর হোম থেকে।

বছরের পর বছর দু'টি হোম চালিয়ে

রমরমিয়ে শিশু পাচারের এই কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল চন্দনা চক্রবর্তী। একটি হোমের নাম বিমলা শিশু গৃহ। আর-একটি আশ্রয়। বিমলা শিশু গৃহ স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সির অনুমোদনপ্রাপ্ত। অভিযোগ, সেখানে বহুদিন ধরে শিশু পাচারের কারবার করত চন্দনা। যেসব নিঃসন্তান দম্পতির বহু টাকা রয়েছে, যারা শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য আগ্রহী, তাদের বাছাই করে নিয়ে তাদের হাতে মোটা টাকার বিনিময়ে শিশু হস্তান্তর করছিল চন্দনা বহুদিন ধরে। কিন্তু যখন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি তৈরি হল, যখন দত্তক প্রথার ভাল আইনি ব্যবস্থা চালু হল, যখন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটি (কারা)-র মতো সংস্থা চলে এল, তখন চন্দনার মতো সদ্যোজাত শিশু পাচারকারীরা বিপাকে পড়ল। আর চন্দনারা তখন বেআইনি দত্তক দেওয়ার কারবার থেকে মোটা টাকা রোজগার চালিয়ে যেতে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি বা শিশুসুরক্ষা কমিটির কর্তাদের হাত করার কাজে নামল। যেমনটা হয়েছে এখানে—দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির শিশুসুরক্ষা আধিকারিক ও শিশুকল্যাণ সমিতির সদস্যদের টোপ দিয়ে ফাঁদে ফেলা। যে ফাঁদে পড়েছেন মৃণাল ঘোষ, তাঁর স্ত্রী সস্মিতা ঘোষ ও ডাক্তার দেবাশিস চন্দর মতো ব্যক্তিরা। এক স্বেচ্ছাসেবী বলছিলেন, বহুদিন আগের ঘটনা। কমপক্ষে আট-দশ বছর আগের। তখন এত শিশু দত্তক দেওয়ার আইনি ঝক্কি ছিল না। একবার রাতে এনজেপি স্টেশনে এক মানসিক ভারসাম্যহীন সন্তান প্রসব করল। স্বেচ্ছসেবীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে দ্রুত চন্দনা তার বিশেষ গাড়ি নিয়ে রাতেই হাজির এনজেপি-তে। সেই স্বেচ্ছাসেবীর তখন জানা ছিল না যে, চন্দনা শিশু বিক্রি করে। চন্দনা সেই সদ্যোজাত শিশুকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ির হোমে নিয়ে যায়। তারপর কী হল সেই শিশুর তা অবশ্য জানা নেই স্বেচ্ছাসেবীর। তবে তাকে যে ভাল টাকায় বিক্রি করতে পেরেছিল তা পরে অনুমান করতে পারেন সেই স্বেচ্ছাসেবী। তাঁর কথায়, সেই শিশুকে এনজেপি থেকে নিয়ে যাওয়ার ক'দিন পরেই চন্দনা তাঁকে প্রস্তাব দেয়, এরকম রাস্তাঘাটে প্রসবের খবর দিলে তাদের টিম যাবে, আর প্রসবপিছু বা শিশুপিছু সে সতেরো হাজার টাকা করে দিতে প্রস্তুত। যদিও সেই স্বেচ্ছাসেবী তার কুমতলব বুঝে গিয়ে আর চন্দনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। নিজের নাম না ছাপানোর শর্তে এই প্রতিবেদককে চন্দনার এই সত্যি গল্প মেলে

শিশু পাচার-এ ধৃত জলপাইগুড়ির ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার সস্মিতা ঘোষ

ধরলেন তিনি। অন্য এক স্বেচ্ছাসেবীও নিজের নাম না ছাপানোর শর্তে জানালেন সাত-আট বছর আগের এক ঘটনা। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক মহিলা থাকতেন। তাঁর সদ্যোজাতর শরীরে ঘা তৈরি হল। স্বেচ্ছাসেবী খবর দিলেন চন্দনাকে। তখনও তিনি ভাবতেন, চন্দনা বেশ ভাল। শিশুদের হোমে রেখে কত সুন্দর যত্ন করে! পিছনে যে তার কালো কারবার চলে তা তাঁর জানা ছিল না। সেই শিশুর খবর পেয়েই চন্দনা জংশন স্টেশনে হাজির। স্বেচ্ছাসেবীকে ওই খবর দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইল চন্দনা। তিনি বললেন, এই টাকাটা শিশুর মায়ের খাবারের জন্য লাগবে। স্বেচ্ছাসেবী টাকা না নিয়ে সেই মহিলাকে চন্দনার জলপাইগুড়ির হোমের খবর দিলেন। সেই মহিলা জলপাইগুড়ি গেলেন। পেয়েও গেলেন পাঁচ হাজার টাকা। তবে টাকা নেওয়ার সময় তাঁর ছবি তুলে রাখা হল। তাঁকে দিয়ে অনেক সইও করিয়ে রাখা হল। পরে যখন সেই মহিলা তাঁর শিশুর জন্য আবার তদবিরে গেলেন, চন্দনা তাঁকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিল। বলল, তুমি টাকা নিয়েছ। আবার শিশু খুঁজতে এসেছ কেন? আবার টাকা দাবি করলে পুলিশে দেওয়া হবে। সেই অশিক্ষিত মহিলা তখন ভয়ে শিলিগুড়ি থেকে একেবারে তাঁর ভিন রাজ্যের বাড়িতে। আর তাঁকে কেউ দেখেনি জংশন স্টেশনে। এক স্বেচ্ছাসেবীর কথায়, চা-বাগান থেকেও সরাসরি সদ্যোজাত নিয়ে চন্দনা বিক্রি করে দিয়েছে বাইরে। বহুদিন আগে, তখন এত আইনি ব্যাপারস্যাপার হয়নি।

আইনি পথে শিশু দত্তক নেওয়া অনেক পরিশ্রমের। অনেক কাগজপত্র তৈরি করতে হয়। ফলে সেই পথে না গিয়ে অনেকে বেআইনি পথে টাকা দিয়েই দত্তক নিতে আগ্রহী। আর তার সুযোগেই চন্দনারা দিনের পর দিন জঘন্য ব্যবসা চালিয়ে তাদের সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে। এই দত্তক প্রথা অনলাইন হতেই চন্দনা আরও বিপাকে পড়ে। সতেরোটি শিশু উধাও হওয়ার খবর চলে আসে সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স এজেন্সির কাছে। তিন বছর আগের ঘটনার ব্যাকডেটেড হিসেব মেলাতে গিয়ে সব ফাঁস হয়। সিআইডি-র আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, সতেরোটি শিশু নিখোঁজের হিসেব কারা-র ওয়েবসাইটে অনলাইন তৈরি করেছিলেন ডাক্তার দেবাশিস চন্দ। আর তাঁকে সেই কাজ করতে নির্দেশ দেন দার্জিলিঙের শিশুসুরক্ষা আধিকারিক মৃণাল ঘোষ। সেই বেআইনি কাজ করতে গিয়েই কারা-র সাইট থেকে তথ্য পেয়ে যান সাইবার ক্রাইম বিভাগের লোকজন। তাঁরা ধরে ফেলেন চন্দনাসহ শিশু পাচারচক্রটিকে। অভিযোগ, চন্দনার হোমের মাধ্যমে বেআইনিভাবে মোটা টাকায় শিশু বিক্রি বা শিশু পাচার বা বেআইনি দত্তকের এই কারবারে যুক্ত ছিলেন মৃণাল ঘোষ। মৃণাল ঘোষ এর জন্য শিশুপিছু কমপক্ষে পঁচিশ হাজার টাকা পেতেন। টাকার ভাগ আসত মৃণালের স্ত্রীর কাছেও। আর ডাক্তার চন্দ ছিলেন হোমের ডাক্তার। অভিযোগ, চন্দনার একটি হোমে কুমারী মেয়েদের সন্তান প্রসব করিয়ে সেইসব শিশুও বিক্রি করা হত। আর সেইসব কুমারী মায়ের হাতে কিছু টাকাও তুলে দেওয়া হত। আর এইসব ছবিই তুলে রাখা হত, যাতে ভবিষ্যতে কুমারী মায়েরা তাদের শিশুসন্তানের কথা লজ্জায় বা ভয়ে কাউকে বলতে না পারে।

অভিযোগ, চন্দনা দিনের পর দিন শিশু বিক্রি করে যেমন অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তেমনই তার প্রভাব তৈরি হয়েছিল প্রশাসনের উপরমহলেও। ফলে তার উপর কেউ কথা বলতে পারত না। জলপাইগুড়ি

শিশু পাচার-এ ধৃত চন্দনা চক্রবর্তী ও (ডানদিকে) সোনালি মণ্ডল।

সিডব্লিউসি-তে তেমন প্রভাব খাটানো যাবে না ধরে নিয়ে চন্দনা শিলিগুড়িতে প্রায়ই ছুটে আসত তার সঙ্গী মৃণাল ঘোষের কাছে। মৃণাল ঘোষ ২০০৯ সালে শিলিগুড়ি এসে প্রথমে সিনি, পরে কনসার্নে কাজ নেন। ধীরে ধীরে সেই হোমের জন্য বহু টাকার অর্থ বিনিয়োগ মুম্বই থেকে এনে দেবেন বলে মৃণাল কনসার্নের মহিলা মালকিনের কাছাকাছি চলে আসেন। সেই টাকা মুম্বই থেকে এনে দেবার পর মৃণাল বেসরকারি হোম কনসার্নের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। তাঁর বাড়ি বারাসতে হলেও তিনি তাঁর প্রভাব খাটিয়ে ধীরে ধীরে দার্জিলিং জেলার সিডব্লিউসি-র চেয়ারম্যান, পরে জেলা শিশুসুরক্ষা আধিকারিক হয়ে ওঠেন, আর তাঁর রমরমা কারবার চালিয়ে যেতে থাকেন। আর তিনি যে চন্দনার সঙ্গে শিশু বিক্রির কারবার থেকে কমিশন পেতেন তা কাউকে বুঝতে দিতেন না। সকলের সঙ্গে তিনি সদ্ভাব রাখতেন, যাতে বাইরে থেকে কেউ তাঁকে সন্দেহ করতে না পারে। অভিযোগ, জেলা প্রশাসনের অনেককেই ঘোল খাইয়ে চন্দনাকে নিয়ে ভালই কারবার ফেঁদে বসেছিলেন মৃণাল। এমনকি ব্যবসার রমরমা বাড়াতে কনসার্নের অনেককেই তিনি সিডব্লিউসি-র সদস্য করিয়ে নেন। অভিযোগ, এক-একটি শিশু বিক্রি বাবদ তাঁর কমিশন আসত পঁচিশ হাজার টাকা করে। আর কনসার্নে কাজ না করলেও সেখান থেকে তাঁর মাসে দশ হাজার টাকা বাঁধা ছিল বলে অভিযোগ। কনসার্নের কিছু কর্মীর অভিযোগ, তাঁদের থেকে ন'হাজার টাকা বেতন তোলার জন্য সই করিয়ে নেওয়া হলেও দেওয়া হত চার হাজার টাকা। আর কনসার্নের হোমে যে শিশুদের নামে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর টাকা ও ফান্ড আসত, সেই শিশুদের নিয়মিত মোটা পচা চাল ও পচা সবজির তরকারি খেতে দেওয়া হত। সেইসব পচা সবজি আসত শপিং মল থেকে। শপিং মল থেকে যেসব পচা সবজি ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার কথা তা ডাস্টবিনে না ফেলে আসত শিশুদের জন্য। পুলিশ ও সিআইডি-র টিম ইতিমধ্যে কয়েকবার কনসার্নে হানা দিয়েছেন। তাঁরা অনেক কাগজপত্র পরীক্ষা করেছেন। বহু অভিযোগ তাঁদের কাছে জমা হয়েছে কনসার্ন সম্পর্কে। যদিও কনসার্নের কোঅর্ডিনেটর তাপস কর্মকার ওইসব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য, মিথ্যে প্রচার হচ্ছে কনসার্ন সম্পর্কে। ইতিমধ্যেই কয়েকবার সিআইডি-র জেরার মুখে পড়েছেন তাপস। প্রসঙ্গত, রাজ্য পুলিশের এক প্রাক্তন ডিজি-র উদ্যোগেই চালু হয় এই কনসার্ন। সেখানকার একসময়কার কাজ দেখে প্রশংসা করেন প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি। আজ তার এই করুণ দশা নিয়ে অভিযোগ মুখে মুখে। শিশু পাচারের নাম উঠতেই মৃণাল ঘোষের অঙ্গুলিহেলনে বেড়ে ওঠা ওই কনসার্নও চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মহলে। অভিযোগ, শিশু পাচারের অন্যতম হোতা চন্দনা চক্রবর্তী প্রায়ই আসত কনসার্নে। প্রাথমিকভাবে সিআইডি সতেরোটি শিশু নেই বলে হদিশ পেয়েছে। কিন্তু কত হাজার হাজার সদ্যোজাত যে এভাবে বেআইনিভাবে পাচার হয়েছে, তার কোনও হিসেবই নেই। কে-ই বা তার হিসেব বার করবে? তবে যারা দত্তক নিয়েছে বেআইনিভাবে বা যারা মোটা টাকার বিনিময়ে শিশু কিনেছে, সেই জঘন্য প্রথা বন্ধ করে সবকিছুতে স্বচ্ছতা নিয়ে আসার দাবি উঠেছে। আর সেইসব পাচার হওয়া শিশু উদ্ধার করা বা যারা তাদের কিনেছে, তাদেরও সামনে আনার দাবি উঠেছে। অভিযুক্তরা অবশ্য প্রত্যেকে সিআইডি হেপাজত থেকে হাসপাতাল বা আদালতে যাওয়ার সময় বারবার দাবি করেছেন সংবাদমাধ্যমের কাছে যে, তাঁরা নির্দোষ। তাঁদের সবাইকেই নাকি ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ওই শিশুরা কোথায় গেল? ওই শিশুরা কথা বলতে পারে না বলেই কি তাদের প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ? শিশুর অধিকার আর কতদিন এভাবে ভূলুণ্ঠিত হবে? শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের সুরক্ষার জন্য সরকার বহু আইন, বহু নিয়ম চালু করছে, আর কিছু পাষণ্ড সব আইন ভেঙে শিশুসুরক্ষার কথা বলে চরম অপরাধ করে চলেছে। সমাজকর্মী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় পরিষ্কার বলেন, যারা এইসব মানব পাচার করে, তাদের চরম থেকে চরমতম শাস্তিই প্রাপ্য। এ অপরাধ মেনে নেওয়া যায় না।

প্রাক্তন এক চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য বলেন, ২০১৪ সালেই তাঁরা এই বেআইনি কারবার নিয়ে জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন লিখিতভাবে। সদ্যোজাত শিশু রাখার জন্য দার্জিলিং জেলার তিনধারিয়াতে মিশনারিজ অব চ্যারিটি পরিচালিত স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সি থাকা সত্ত্বেও শিশুসুরক্ষা আধিকারিক জলপাইগুড়িতে চন্দনার হোমে সব শিশু রাখা বা পাঠানোর জন্য তাঁদের চাপ দিতেন কেন? জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব এ প্রশ্নে বলেন, তাঁরা সব খতিয়ে দেখছেন। আর শিশুসুরক্ষার দিকটা যাতে চাঙ্গা হয়, তাঁরা সেদিকে ধীরে ধীরে নজর দেবেন। তবে তার আগে বর্তমান শিশু পাচারকাণ্ড নিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হোক।

নিজস্ব প্রতিবেদন

মজুরি কম তাই চা-শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে পাড়ি দেবার প্রবণতা বাড়ছে

‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে চায়ের ডুয়ার্সের কোণে কোণে ঘুরে তুলে আনা জ্বলজ্যান্ত ছবি পেশ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা** তাঁর ধারাবাহিক প্রতিবেদনের **দ্বাদশ পর্বে**।

গত পনেরো বছরে কতবার যে ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগানে, তার পরিসংখ্যান দিতে গেলে পরিসংখ্যানবিদরাও ফেল করে যাবেন। ফ্যাক্টরির গেটে তালা গত সাড়ে তিন বছর ধরে। ২০১৩ সালে রেড ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে বন্ধ হয়েছে ধরণিপুর চা-বাগান। ক্যারন চা-বাগান বন্ধ গত ১৬ নভেম্বর ২০১৬ থেকে। ডানকানসের বন্ধ ডিমডিমা চা-বাগানে নিত্য হাহাকার। তবুও এরই মধ্যে কুপি এবং লণ্ঠনের আলোয় আধপেটা ভাত পেটে নিয়েই মাধ্যমিক পরীক্ষার বৈতরণি পার হল শ্রমিক পরিবারের সন্তানসন্ততিরা। চা-বাগিচার মাসিক মজুরির স্থায়ী আয় হারিয়েছে অনেকেরই বাবা-মা। বিলাস বা সচ্ছলতা না থাকলেও নিত্য অভাব ছিল না। কিন্তু এখন পড়াশোনা চালানোই কঠিন এইসব অভাবী পরিবারের সন্তানদের। ‘কী হবে পড়াশোনা করে?’ হতাশাগ্রস্ত জয়ন্তীর পড়াশোনার ইচ্ছা। রেড ব্যাঙ্কের আপার লাইনের জয়ন্তী ওঁরাওয়ের মা ফুলকুরিয়া এবং বাবা এতোয়া মারা গিয়েছে। সংসার চালাতে হিমশিম অবস্থা জয়ন্তীর দাদা সুজিতের। সেই দাদার কাছেই বেড়ে ওঠা জয়ন্তী জানায়, ‘কীভাবে পড়াশোনার খরচ আসবে? দাদার নিজেরই সংসার চলে না, রোজ স্কুলে যেতে পারিনি। বানারহাটে আসা-যাওয়া, টিফিন— প্রত্যেকদিন ২০ টাকা করে লাগে। কোথায় পাবে দাদা?’ জয়ন্তীর সহপাঠী অঞ্জলিও কোনওরকমে শুধু স্কুলে গিয়েছে। কোনও গৃহশিক্ষক রাখার প্রশ্নই নেই কারও। অঞ্জলি ওঁরাওয়ের বাবা সোমরা বা জয়ন্তীর দাদা সুজিত প্রত্যেকেই পাশের ডায়না নদী থেকে ট্রাকে বোল্ডার বোঝাই করে। সোমরার দুই ছেলে, এক মেয়েকে নিয়ে পরিবার। নুন আনতে পানতা ফুরনোর দশা এদের। বন্ধ হওয়া ধরণিপুরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ২০ জন। বন্ধ ক্যারন চা-বাগানের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৬। ডিমডিমা চা-বাগিচাতেও ৩০-৪০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বসেছিল জীবনকে বাজি রেখেই। রেড ব্যাঙ্কে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল ২৫ জন ছাত্রছাত্রী। প্রত্যেকেই শ্রমিক পরিবারের সন্তান। কুমলাই, জয়বীরপাড়া, ঢেকলাপাড়া, বান্দাপানি চা-বাগিচার অবস্থা আরও করুণ। বানারহাটের দু’টি হিন্দি মাধ্যমের স্কুলে এই অঞ্চলের অধিকাংশ পড়ুয়া পড়াশোনা করে।

১৬ নভেম্বরের পর থেকে ক্যারন বাগানের শ্রমিকরা কোনও মজুরি না পাবার ফলে বাগান বন্ধ হয়ে পড়ে। ২৯ জানুয়ারি পাকাপাকিভাবে বাগান বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বাগানটির দখলদারি নিয়ে পাতা বিক্রি করে বাগান চালাবার সিদ্ধান্ত নিলে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জলপাইগুড়িতে ডেপুটি লেবার কমিশনারের দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে মজুরি ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাগানটি বন্ধ হয়েছিল, সেই মজুরি জটেরই কোনও সমাধানসূত্র প্রথম দফার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ব্যর্থ হয়ে যায়। জলপাইগুড়িতে অতিরিক্ত শ্রম আধিকারিক পার্থ বিশ্বাসের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে যাবার পরেই সে দিনই জেলাশাসক রচনা ভগত বাগানের মালিক প্রভাসকুমার বসু এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠক করে দু’পক্ষেরই কথা শোনেন। এই বন্ধ ক্যারন চা-বাগানের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৬। কারও পরীক্ষাকেন্দ্র চ্যাংমারি, আবার কারও বা ১০ কিমি দূরবর্তী নাগরাকাটায়। বাগান খোলা থাকলেও যেখানে পরিবহণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে এখনকার এই অবস্থায় প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে অত্যন্ত কষ্টসাধ্যভাবেই ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। আশুতোষ মাহালি, রাজীব ওঁরাও এবং সুস্মিতা মুন্ডাদের মতো ছাত্রছাত্রীরাও এই অসুবিধা মাথায় নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াত করেছে। নিত্যদিনের অভাব-অনটনই এখানকার ছাত্রছাত্রীদের নিত্যসঙ্গী। বাগান থেকে কোনও পরিবহণের ব্যবস্থা না থাকার ফলে ৬ কিমি দূরের লুকসানের বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে। অথচ মালবাজারের মহকুমাশাসক জ্যোতির্ময় তাঁতী পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতের ব্যাপারে প্রয়াস নিলেও কার্যত পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য গাড়ির বন্দোবস্ত করেননি চা-বাগিচা কর্তৃপক্ষ। তাই স্থায়ী আয় হারিয়ে কারও বাবা-মায়ের বর্তমান পেশা নদী থেকে ট্রাকে বোল্ডার বোঝাই করা অথবা পড়াশোনা করতে করতে উপার্জনের তাগিদে নিজেরাই এই পেশা বেছে নিয়েছে পড়াশোনার খরচ চালাবার জন্য— এমন দৃশ্যকল্প ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগিচাক্ষেত্রগুলিতে কম নয়। অনেকেই স্কুলে যেতে পারেনি গাড়ি ভাড়া না জোটার ফলে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কোনও সরকারি আর্থিক সুবিধা মেলেনি— এমন টুকরো টুকরো হাজারো কোলাজে ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগিচার এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যেন জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি।

> দৈনিক মজুরির ক্ষেত্রে শীর্ষে আছেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা শ্রমিকরা, যাঁরা দিনে ৩০৭ টাকা করে মজুরি পান। কেরলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২৪০ টাকা, তামিলনাড়ুতে ১৩২ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে ১২৬ টাকা, আসামে দৈনিক ১০৫ টাকা। বিভিন্ন রাজ্যের এই আলাদা আলাদা মজুরির পরিমাণেই একটা সমতা আনতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার।

কথা হচ্ছিল ক্যারনের ম্যানেজার প্রিয়ব্রত ভদ্র সঙ্গে। প্রিয়ব্রতবাবুও বাগান দ্রুত খোলার ব্যাপারে আশাবাদী। জেলাশাসক রচনা ভগতের দপ্তরে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক বৈঠকে বাগান মালিকদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকের পর, মালিকের বক্তব্য জানার পরে বাগানের শ্রমিক প্রতিনিধিদের

সঙ্গেও বৈঠক করা হয়। শ্রমিকদের বক্তব্য বিশদে জানার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মার্চে বাগান খোলার পর শ্রমিকদের বকেয়া পাঁচটি পাক্ষিক মজুরির মধ্যে দু'টি মালিকপক্ষ মিটিয়ে দেবে, এবং বাকি বকেয়া তিনটি পাক্ষিক মজুরি বাগান খোলার দেড় মাসের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। পনেরো দিন পরপর একটি করে চালু মজুরির সঙ্গে সঙ্গে বকেয়া মজুরিও দিয়ে দেওয়া হবে। তৃণমূল টি প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কারস' ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অমরনাথ ঝাঁ জেলাশাসকের বাগান খোলার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মতে, শ্রমিকদের মজুরি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পেনশন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার দাবিও তুলেছেন অমরনাথবাবু।

তবে অন্ধকারের মাঝেও রুপোলি আলোর ঝলক মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ে। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক তথা রাজ্যের নবগঠিত টি ডিরেক্টরেটের সদস্য সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে আসামের কয়েকজন চা-বাগান মালিক দীর্ঘদিন বন্ধ মানাবাড়িসহ অন্য কিছু বাগান কিনতে চেয়ে দেখা করেন। তাঁর উপস্থিতিতে রাজ্য বিধানসভা ভবনে শ্রম মন্ত্রীর কক্ষে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। আসামের চা-বাগিচা মালিক সুব্রত সাহার সঙ্গে এই রাজ্যের আরও দু'জন চা-বাগিচা মালিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সুব্রত সাহা ইতিপূর্বে তোতাপাড়া বাগানটি কিনে চালাচ্ছেন। তবে বাগান চালাতে গিয়ে তিনি যে কিছু কিছু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, সে কথাও তিনি কবুল করেন শ্রম মন্ত্রীর কাছে। সুব্রতবাবুর বক্তব্য, আসামে যদি চা-বাগিচাগুলি ভালোভাবে চলতে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গে চলবে না কেন? চা-বাগিচাগুলির অচলাবস্থার পিছনে শ্রমিক অসন্তোষ একটা বড় কারণ বলে তিনি মনে করেন। সুব্রতবাবু রাজ্যের বন্ধ মানাবাড়ি এবং ডানকানস গোষ্ঠীর বন্ধ বাগানগুলি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করাতেই এই ব্যাপারে সার্বিকভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

তবে শ্রমিক অসন্তোষ যে বড় ফ্যাক্টর—এটা মানতেই হবে। কাজ না করে মাইনে নেবার কর্মসংস্কৃতি বন্ধ করতে মালিকপক্ষ যেমন বদ্ধপরিকর, তেমনি শ্রমিকরাও মরিয়া যেনতেন প্রকারেণ দায়সারাভাবে কাজ করার জন্য। ফলে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, উৎপাদন কমে যাচ্ছে। দীর্ঘ ৫৬ দিন বন্ধ ছিল ইসলামপুরের সুজালি গ্রিন ভ্যালি টি অ্যান্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বাগান। মালিকপক্ষের উপস্থিতিতে তরাই প্ল্যান্টারস দপ্তরে টিপা-র হস্তক্ষেপে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে মালিকপক্ষ কিছু শর্ত আরোপ করলে সেই শর্ত শ্রমিক নেতারা মেনে নেন। ফলে সংস্থার অধীনে চোপড়া থানার গুঞ্জাবাড়ির রিভার ভিউ, মাটিকুন্ডা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রিন ভ্যালি চা-বাগান এবং সুজালির চা ফ্যাক্টরি খুলে যায়। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের আট ঘণ্টা কাজ করার গ্যারান্টি দাবি করে। স্থায়ী শ্রমিকরা অবসর গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট পরিবার থেকে আর স্থায়ী ভিত্তিতে শ্রমিক নেওয়া হবে না বলে দাবি করেন মালিকপক্ষ। কারণ তাঁদের যুক্তি, বাগানগুলিতে এমনিতেই স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। সেই পদে অস্থায়ীভাবে ওই পরিবারের একজনকে কাজে নেওয়া হবে।

পাশাপাশি শ্রমিক নেতারা দু'মাসের বকেয়া বেতন দাবি করলে মালিকপক্ষ তা মেনে নেন। বোনাস চুক্তিতে জানানো হয়, উত্তর দিনাজপুর জেলার শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের দেয় বোনাসের হারেই বাগিচা শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হবে। মাটিগাড়াতে তরাই প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে গুডরিক সংস্থার পরিচালন সমিতির এক কর্তা শৈলেন্দ্র বরগোঁছাইয়ের সঙ্গে আলাপ হল। কথায় কথায় তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম, ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত গুডরিক সংস্থার অধীনে মোট চা-বাগিচা এলাকা ছিল ৯৬৪৩ হেক্টর। উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ ছিল ১৬ মিলিয়ন কেজি। অর্ধেক চা সংস্থা বিক্রি করত মোড়কজাতকরণের মাধ্যমে। সংস্থার অধীনে রয়েছে ৩০টি বাগান। সেগুলি দার্জিলিং ছাড়াও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ডুয়ার্স এবং আসামে। ধাপে ধাপে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা বিনিয়োগ করে আসামের কিছু চা-বাগিচা এলাকা অধিগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে গুডরিক সংস্থার। অধিগ্রহণ শেষে গুডরিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে আরও চার-পাঁচ মিলিয়ন কেজি। নিজেদের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যেই আসামে প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করতে চায় গুডরিক। বড় সমস্যা এখানকার আবহাওয়া। গত কয়েক বছরে এটি সংশ্লিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে গভীর উদ্‌বেগের কারণ বলে তিনি মনে করেন। তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে, চিন, শ্রীলঙ্কা বা কেনিয়ার মতো দেশগুলি যেভাবে পেশাদারি মনোভাব নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের চা-পাতা বিক্রি করেছে, তেমন মনোভাবের কিছুটা হলেও অভাব আছে ভারতীয় চা শিল্পপতিদের ক্ষেত্রে।

শ্রমিক নেতা অমরনাথ ঝাঁ-র মতে, 'চা-বাগিচার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসা প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের। চা-বাগিচা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি হ্রাস-বৃদ্ধির উপর কেন্দ্রের সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও এই ব্যাপারে রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আবেদন করতেই পারে কেন্দ্র। আসলে মোদি সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের ফলে চা শ্রমিকদেরই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ করছে পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের চা উৎপাদক রাজ্যগুলি। এই মুহূর্তে দেশের চা উৎপাদক রাজ্যগুলিতে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ এক-একটি রাজ্যে এক-একরকম। দৈনিক মজুরির ক্ষেত্রে শীর্ষে আছেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা শ্রমিকরা, যাঁরা দিনে ৩০৭ টাকা করে মজুরি পান। কেরলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২৪০ টাকা, তামিলনাড়ুতে ১৩২ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে

ডেঙ্গুঝাড়ের চা-বাগানে ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পিকনিকে মাতলেন শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা

চা-বাগানে শ্রমিকদের প্রিয় উৎসব 'মোর্গা লড়াই'

১২৬ টাকা, আসামে দৈনিক ১০৫ টাকা। বিভিন্ন রাজ্যের এই আলাদা আলাদা মজুরির পরিমাণেই একটা সমতা আনতে চাইছে কেন্দ্র। কারণ কোনও রাজ্যে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির পরিমাণ কত হবে তা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার সেখানকার পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয় দেখে স্থির করে। ফলে রাজ্যভেদে সেগুলির মান ভিন্ন হয়।' অমরনাথবাবুকে প্রশ্ন করি, 'মজুরির ক্ষেত্রে সমতা আনা আদৌ কি সম্ভব?' তাঁর মতে, 'সব রাজ্যে সমান হারে মজুরি দিতে হবে, সেই আবেদন রাজ্যগুলির কাছে করা সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই মজুরির পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি করে একটা ভারসাম্য তো বজায় রাখাই যায়।'

আর মজুরি কম হওয়ার কারণেই শ্রমিক সংকটে ভুগছে উত্তরবঙ্গের চা-শিল্প। তরাই ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা-বাগিচায় শ্রমিকের অভাবে বাগানের স্বাভাবিক কাজকর্ম নষ্ট হতে বসেছে। সরকার নির্ধারিত দৈনিক মজুরির চেয়ে বেশি মজুরি দিয়েও বাগানে কাজের লোক পাওয়া যাচ্ছে না বলে মালিকপক্ষের একাংশ হতাশা ব্যক্ত করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, শ্রমিকরা যাচ্ছেন কোথায়? বাগান সূত্রের খবর, চা-বাগিচায় কাজ করে দৈনিক যে পয়সা মেলে, তার চেয়ে বাইরে কাজ করলে বেশি মজুরি মিলছে। তাই দলে দলে শ্রমিকরা অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যাচ্ছেন। একটা সময় চা শিল্পকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এসেছিল। বেকারত্ব ভুলে মানুষ চা-বাগানে কাজ করে সেই আয় দিয়েই সংসার চালাতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ বেশি রোজগারের টানে বাগানের কাজ ছেড়ে শহরে বা ভিন রাজ্যে কাজে যাচ্ছেন। বাগান মালিকরা বলছেন, কোনও শ্রমিকই খাতায়-কলমে কাজ ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন না। বাগানে দিনের পর দিন শ্রমিকদের অনুপস্থিতি দেখেই খোঁজখবর করে জানা গিয়েছে যে, তাঁরা অন্যত্র কাজে গিয়েছেন। প্রতিদিনই বাগানে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব উদয়ভানু দাসের মতে, শ্রমিকের অভাবে চা শিল্পে ভয়াবহ সমস্যা তৈরি হয়েছে। রোজই বাগানে শ্রমিকদের অনুপস্থিতির হার বাড়ছে। দেখা যাচ্ছে, বাগানের শ্রমিক আবাসন থেকেই একটি শ্রমিক পরিবারের স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই হয়ত বাগানে কাজ করছেন। তাঁরা সরকার নির্ধারিত মজুরিও পাচ্ছেন, কিন্তু বেশি মজুরির লোভে পুরুষ শ্রমিকরা বাইরে চলে যাচ্ছেন। তাই শ্রমিক না পেয়ে বাগানগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর মতে, শ্রমিকরা বাগানে যে দৈনিক মজুরি পান, তার তুলনায় বাইরে রাজমিস্ত্রি বা অন্য কোনও কাজ করলে তাঁরা দৈনিক ২০০-২৫০ টাকা বেশি রোজগার করছেন। ভিন রাজ্যে দৈনিক মজুরি আরও বেশি। কাজেই পরিবারকে বাগানে রেখে দিয়ে তাঁরা বাইরেই কাজ করতে যাচ্ছেন।

ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে করতেই এসে পৌঁছালাম শিরীষতলায় বিজয়গোপালদার বাড়িতে। বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির জেলা সম্পাদক তথা সর্বভারতীয় সভাপতি। ক্ষুদ্র চা-চাষ, চা শিল্পের সমস্যা, সম্ভাবনা, প্রতিকারের উপায়, চলতি ক্যাশলেস ব্যবস্থা নিয়ে তিনি এক-এক করে সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান প্রক্রিয়া আরও ছ'মাস পিছানোর দাবি তুলে ইতিমধ্যেই জেলাশাসককে চিঠি দিয়ে তাঁর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, ছোট ছোট চা-বাগিচার শ্রমিকরা অনেকেই প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস করেন। সেইসব স্থানে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা তো দূরের কথা, কাছাকাছি ব্যাঙ্কের শাখাই কোথাও কোথাও ন্যূনতম ৩০ কিমি দূরে। নোট বাতিলের পর অনেকদিন কেটে গেলেও এখনও বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাঙ্কের পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। এখনও কমবেশি নোটের আকাল চলছে। এর মধ্যেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মজুরি দেওয়া হলে ব্যাঙ্ক শ্রমিকদের পর্যাপ্ত টাকা দিতে পারবে না। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, জেলার ন'টি ক্ষুদ্র চা-চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ইতিমধ্যেই তাদের শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিলেও শ্রমিকরা ঠিকমতো টাকা তুলতে পারছে না। তার উপর নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে চাইলেও ব্যাঙ্কগুলির থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় ব্যাঙ্ক মিত্র, ব্যাঙ্ক সহায়ক বা মোবাইল এটিএমের মতো বিকল্প ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

সত্যিই, গত তিন মাসের নোটের গেরোয় বড়ই ফেঁসেছেন ক্ষুদ্র চাষিরা। আমি যখন চা-বাগিচাগুলিতে ঘুরে মজুরি সমস্যা মেটাতে জেলা প্রশাসন, পরিচালকবর্গ, ব্যাঙ্ক কীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, তার সুলুকসন্ধান করছি, তখন সত্যি কথা বলতে কী, ক্ষুদ্র চা-চাষিদের সমস্যা আমার নজরে এলেও তাঁদের সমস্যার কথা যখন প্রকাশিত হবে, তখন হয়ত সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে। কারণ পাক্ষিক পত্রিকায় মাসে লেখা বেরবে দুটো, এক মাসে তিস্তা-তোর্সা-মহানন্দা-বালাসন-জলঢাকা-কালজিনি-মানসাই দিয়ে বয়ে যাবে অনেক জল। বড় নোটের সমস্যায় বিপাকে পড়েছিল জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা-চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি। জেলার ময়নাগুড়ি, ধূপগড়ি, মাল ব্লকের লাটাগুড়িতে দশটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিজস্ব চা-ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। টাকার সমস্যায় সেগুলির কাজ এগয়নি। জলপাইগুড়ি জেলায় চা-চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ৬৯। সমগ্র উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ৭২। কেবলমাত্র ময়নাগুড়ি ব্লকেই আছে ২৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকে ২টি এবং সদর ব্লকে ১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নিজস্ব চা ফ্যাক্টরি রয়েছে। ময়নাগুড়ি ব্লকে আরও ৫টি ক্ষুদ্র চা-চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিজস্ব চা ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল। আর্থিক সমস্যায় সেগুলির কাজও এগয়নি। দেশের মধ্যে ভোটপট্টির জয় জল্পেশ স্মল টি গ্রোয়ারস

সোসাইটি সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী। ৫২২ সদস্যবিশিষ্ট এই গোষ্ঠী গড়ে ২০০৪ সালে গোষ্ঠীর সদস্যরা চা-চাষ শুরু করেন, ২০১৩ সালে নিজস্ব ফ্যাক্টরি গড়েন। এলাকার ৩৩৫ হেক্টর জমিতে বছরে ৩৬ লক্ষ কেজি কাঁচা চা উৎপন্ন হয়। তৈরি চা উৎপন্ন হয় ৮ লক্ষ কেজি। সপ্তাহে ২০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন থাকলেও তীব্র আর্থিক টানাপোড়েনে গোষ্ঠী ভাঙার উপক্রম হয়। উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চা-চাষি সমিতির সভাপতি রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ক্ষুদ্র চা-চাষিরা সঠিক দাম এবং সঠিক সময়ে পাতার দাম না পেলে তাঁরা গোষ্ঠীতে থাকবেন কেন? ফলে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বিজয়গোপালবাবুর মতে, ক্ষুদ্র চা-চাষিদের কাঁচা পাতার দাম সেই সময়ে মেটানোই যাচ্ছিল না। তাঁদের কেউ কেউ কাঁচা চা-পাতা সরবরাহ বন্ধই করে দিতে চেয়েছিলেন। ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছিল। ক্ষুদ্র চা-চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে ভাঙন ধরছিল। কারণ ক্ষুদ্র তাঁদের হাতে সময়মতো টাকা তুলে দিতে না পারলে গোষ্ঠী টিকিয়ে রাখা খুবই সমস্যার কাজ। রাজগঞ্জ ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর স্মল টি গ্রোয়ারস সোসাইটির সম্পাদক হরকিশোর রায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এলাকার মোট ১০টি গ্রামের ৮০ জন চা-চাষি নিয়ে ২০০৭ সালে গোষ্ঠী গড়ে চা-চাষ শুরু হয়। প্রতিদিন ৪০০০ কেজি চা-পাতা উৎপন্ন হয়। ফলে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের হাতে সময়মতো টাকা তুলে দিতেই হবে। মাল ব্লকের ডুয়ার্স মৌলানি স্মল টি গ্রোয়ারস সোসাইটির সভাপতি আবু কাসেমের কাছ থেকে জানা গেল, এলাকার ৫০০ বিঘা জমিতে ৮৬ জন ক্ষুদ্র চা-চাষি চাষ করেন। সপ্তাহে কমপক্ষে আড়াই লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক থেকে দু'দফায় পাওয়া গিয়েছে ১২,০০০ টাকা। সদস্যদের কাঁচা চা-পাতার দাম মেটাতে সমস্যা হয়েছে। সদর ব্লকের লোকনাথ ক্ষুদ্র চা-চাষি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্পাদক অরুণকুমার রায় বলেন, ২০০৮ সালে ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট গড়ে ওঠা গোষ্ঠীতে সপ্তাহে ২ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র চা-চাষি তথা সদস্যদের দিতে হয়। কিন্তু টাকা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারেননি বলে অভিযোগ। শ্রমিক এবং সদস্যদের সময়মতো টাকা মেটানো যায়নি সেই পর্বে। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও সমস্যা কিন্তু দূর হয়েছে মনে করলে সত্যের অপলাপ হবে।

ক্ষুদ্র চা-চাষিদেরকেও নিজস্ব ফ্যাক্টরি গড়ার অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রক। গত ৩ জানুয়ারি এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে এখন থেকে ক্ষুদ্র চা-চাষিরা নিজেদের উৎপাদিত কাঁচা পাতা নিজেদের ফ্যাক্টরিতেই প্রক্রিয়াকরণ করতে পারবেন। তিনি জানান, সরকারি ঘোষণাকে স্বাগত। দীর্ঘ দিনের দাবি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেওয়ায় উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা-চাষিরা ভীষণই খুশি। গুণগতমান ভাল থাকলেও এখন থেকে ক্ষুদ্র চাষিদের উৎপাদনও রপ্তানি তালিকায় চলে আসবে। তবে মিনি টি ফ্যাক্টরিগুলির উৎপাদিত চা যাতে নিলামকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়, সেটা সুনিশ্চিত করা একান্তই প্রয়োজন। মিনি টি ফ্যাক্টরিগুলিকে চরিত্রগতভাবে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সঙ্গে যাতে মিলিয়ে না দেওয়া হয়, সেটাও সরকার এবং টি বোর্ডের দেখা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালের সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুযায়ী কাঁচা চা-পাতা প্রক্রিয়াকরণের অর্থাৎ তৈরি চা উৎপাদনের সর্বশেষ ধাপটি ছিল বটলিফ টি ফ্যাক্টরি। পুরনো নির্দেশিকায় সংশোধনী এনে এবার থেকে ক্ষুদ্র চা-চাষিদেরও টি ফ্যাক্টরি গড়ার এবং হাতে তৈরি চা উৎপাদন করে থাকে। উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা-চাষির সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। বার্ষিক উৎপাদনের ৪৫ শতাংশই আসে ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলির কাঁচা পাতা থেকে।

তবে সবশেষে যে কথা বলার, সেটি হল, বন্ধ চা-বাগিচা পুনরায় খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে প্রশংসা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বান্দাপানি, রেড ব্যাঙ্ক, ধরণিপুর, সুরেন্দ্রনগর চা-বাগিচার জমি লিজে দেওয়ার প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বাগান চারটে খোলার ব্যাপারে নয়া উদ্যোগপতি খোঁজার কাজ চলছে। ঢেকলাপাড়া চা-বাগানকে ইতিমধ্যেই ই-অকশনে তোলা হয়েছে, যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও ক্রেতা পাওয়া যায়নি। শ্রমিকরা যাতে সামাজিক ও আর্থিক প্রকল্পের সুবিধা পান তা নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকারকে সরাসরি

ডেঙ্গুয়াঝাড় বাগানেই মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা এসবিআই-এর

সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রকের পক্ষ থেকে, যাতে ক্ষুদ্র চাষিরা সিটিসি, অর্থোডক্স কিংবা গ্রিন টি— সব ধরনেরই চা তৈরি করতে পারেন। কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী, মিনি টি ফ্যাক্টরিতে দৈনিক সর্বোচ্চ উৎপাদন মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৫০০ কিলোগ্রাম। ফ্যাক্টরি গড়ার শর্তাবলির মধ্যে অন্যতম হল, কেবলমাত্র নিজেদের উৎপাদিত কাঁচা পাতাই সেখানে ব্যবহার করা যাবে। গত দু'বছর ধরে সমগ্র ভারতে ইতিমধ্যেই ক্ষুদ্র চাষিদের ১৩৪টি মিনি ফ্যাক্টরি তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে চালু থাকা এইরকম ফ্যাক্টরির সংখ্যা বর্তমানে ছ'টি। জলপাইগুড়িতে পাঁচটি এবং দার্জিলিঙে একটি মিনি ফ্যাক্টরি আছে। এইসব ফ্যাক্টরি মূলত অর্থোডক্স, গ্রিন টি অনুরোধ করে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক। টি বোর্ডের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানত কম উৎপাদন, শ্রমিক অসন্তোষ, ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতা, খারাপ গুণমান ইত্যাদি কারণেই এইসব চা-বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রীর পেশ করা রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, রাজ্যের ৭টি চা-বাগিচা বন্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে বাগিচাগুলিতে কর্মরত মোট ছ'হাজারেরও বেশি শ্রমিকের উপর, যার মধ্যে অস্থায়ী শ্রমিকসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। তাই পারস্পরিক মতাদর্শগত বিরোধ থাকুক। কিন্তু গণতন্ত্রের স্বার্থেই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়কেই হাতে হাত মিলিয়ে চা শ্রমিকদের স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে।

এই অল্প দিনেই বুঝেছি এবার কাজ করার সুযোগ মিলবে প্রচুর

মুখোমুখি সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়

উত্তরবঙ্গের তরুণতম সাংসদ। পূর্বতন সাংসদ রেণুকা সিনহার অকাল প্রয়াণে কোচবিহার লোকসভার ভোটদাতারা রেকর্ড ভোটে জিতিয়ে এনেছেন এই শিক্ষক নেতাকে। প্রান্তিক জেলা কোচবিহারের জিরানপুর গ্রাম থেকে আজ দিল্লির লোকসভায় অবাধ বিচরণ। গত কয়েক মাসেই ইঙ্গিত মিলেছে অনেক পোড় খাওয়া নেতাদের সঙ্গেই সমানে পাল্লা দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন তিনি। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে মানুষের এক ঝাঁক প্রশ্ন হাজির করা হয়েছিল তাঁর সামনে।

এখন ডুয়ার্স: শুরুতেই জানতে চাইব আপনার পলিটিক্যাল জার্নির কথা। এত কম সময়ে এই উত্থানের কথা।

পার্থপ্রতিম: প্রথমেই বলি, পারিবারিক সূত্রেই রাজনীতির প্রতি ভাললাগা। এরকম হার্ডকোর পলিটিক্স করব তা কখনওই ভাবিনি। শখ ছিল অধ্যাপনা করার। সে ক্ষেত্রে সফলতাটা পাইনি। পড়াশোনা শেষ করার পরেই আমি অ্যাকটিভ পলিটিক্সে নামি। ২০০৫ সালে আমার মাস্টারস ডিগ্রি কমপ্লিট হয়, সে বছরই চাকরি। দু'বছর মুর্শিদাবাদে পোস্টেড ছিলাম। দু'বছর পর বাড়ি ফিরে সরাসরি রাজনীতিতে নামা। সেই হিসাবে ২০০৭ সাল থেকে অ্যাকটিভ পলিটিক্সে আসা। বাবা-ঠাকুরদা কংগ্রেস ঘরানার লোক ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাই গ্রামীণ এলাকার কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে খুব পরিচিত ছিলাম। তখন থেকেই ভোটের সময় বুথ স্লিপ লেখা, বাবা-ঠাকুরদা ক্যাম্পেন করতে যেতেন, তাঁদের সঙ্গে থাকা— এগুলো খুব ভাল লাগত। কলেজজীবনে তেমনভাবে রাজনীতি করিনি। ২০০৭ সালে আমাকে জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক করা হয়। ২০০৮ সালে বলতে গেলে আমার নেতৃত্বেই সেখানে দীর্ঘ বছর পর বাম-পঞ্চায়েতের অবসান ঘটে। তবে তৃণমূল এককভাবে জেতেনি। ২০০৯ সালে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কোচবিহার ১ নং ব্লকের সাধারণ সম্পাদকের। ২০০৯ থেকে ২০১১ সালে পটপরিবর্তন। সেখানে নাটাবাড়ি থেকে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের জেলা সভাপতি। তাঁর হয়ে অ্যাকটিভলি কাজ করি। ২০১১-র পরে আর পিছন ফিরে তাকানোর অবকাশ হয়নি। ২০১৩ সাল থেকে শিক্ষক সংগঠনের জেলার দায়িত্ব পালন করি। এভাবেই চলতে চলতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে, জেলার নেতৃত্বদের সাহায্যে এই প্রথম কোনও রাজনীতির মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। বাকিটা সকলের জানা।

এখন ডুয়ার্স: আমরা জানি, আমাদের সংবিধানে এমপি একটা ভীষণ সম্মানীয় পদ। ভারতের জনসংখ্যাকে যদি ৫৪৫ ভাগে ভাগ করা যায়, তার একটা অংশের প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনি। এই সংবিধান একজন এমপি-কে প্রচুর ক্ষমতা দেয়। আপনার এমপি হওয়ার ভাবনাটা প্রথম কবে এসেছিল? রাজনৈতিক জীবনটাও তো একটা কেরিয়ারের মতো। রাজনীতিতে বড় হবেন জানতেন, কখনও কি ভেবেছিলেন যে এই পদে যাবেন?

পার্থপ্রতিম: ওই যে বললাম, ২০১১ সালের পর থেকে আর পিছন ফিরে দেখার অবকাশ হয়নি। রাজনীতি ততদিনে ভাললাগা থেকে ভালবাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১১-তেই আমাদের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আমার ভিতরের সেই জেদটাকে উসকে দেন। তখনও বিশ্বাস করিনি, কারণ এরকম প্রান্তিক একটা গ্রাম থেকে উঠে এসে সাংসদ হব, তেমন কথা সত্যিই ভাবতেই পারিনি। তবে সংগঠনটা জেলা জুড়ে করব, তেমনটা ইচ্ছে ছিল। ২০১৩ থেকে চিন্তাটা মূলত মাথায় আসে। ২০১৪ সালে একটা সম্ভাবনা হয় সাংসদ হবার। বিভিন্নভাবে আমার নামটা উঠে আসে। ২০১৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় দিনহাটা মহকুমার অবজার্ভার হিসাবে আমাকে নিয়োগ করা হয়। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রার্থী রেণুকা সিনহার আমি চিফ ইলেকশন এজেন্ট ছিলাম। পরবর্তী ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনেও আমার একটা অ্যাকটিভ পার্ট ছিল। এটাই হয়ত বা জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বের নজরে আসে। অবশ্যই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা-ই হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আমাদের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কথা না বললেই নয়। তিনি না থাকলে আমার এই জায়গায় আসা সম্ভব হত কি না জানি না। তবে এ ক্ষেত্রে একটা কথা বলতেই হবে যে, আমার নির্বাচনের সময় জেলার সমস্ত নেতৃত্ব সর্বশক্তি দিয়ে খেটেছেন। সমস্ত কর্মীর মধ্যে উৎসাহ ছিল সাংঘাতিক।

এ ছাড়াও বেশ কিছু অরাজনৈতিক সংগঠন আমার পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সকলের জন্যই আজ আমি এই জায়গায়। ভোটের মার্জিনই তা প্রমাণ করেছে।

এখন ডুয়ার্স: স্বাধীনতার পর এত বছর ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এমপি ছিলেন। বাম আমলে একজন বেশ কয়েকবার কোচবিহারের এমপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু কোচবিহারের মানুষের একটা ধারণাই হয়ে গিয়েছিল যে, এখানকার এমপি সংসদে গিয়ে তেমন পাত্তা পান না। জেলার লোকরাও এমপিকে চেনে না। দলগত সংগঠনের জোরেই তাঁরা জিতে আসেন। সংসদে কোচবিহার নিয়ে কোথাও কোনও কথা ওঠে না, এখানকার ইস্যু নিয়ে কোনও বিতর্ক হয় না। এইবার কি মনে হয় সেই ধারণাটা ভাঙবে? কোচবিহারের সাংসদ এবার সারা ভারতের সাংসদদের সামনে সত্যিই কোচবিহারের কথা বলবেন? এখানকার কী সমস্যা রয়েছে, এখানকার মানুষ কতটা পিছিয়ে রয়েছে, সেইসব কথা বলবেন?

পার্থপ্রতিম: নিশ্চিতভাবে, ১০০ শতাংশ কথা বলব এসব নিয়ে। এতদিন কী হয়েছে, সেসব নিয়ে আমি ভাবছি না। আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে কোচবিহারের মানুষের প্রতি। সংসদে বেশ কিছু জায়গা আছে সাংসদ হিসেবে নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি, নিজের রাজ্য, নিজের দেশের স্বার্থে কিছু বলার। সেগুলোতে পার্টি হস্তক্ষেপ করে না। আবার এমন কিছু ইস্যু আছে, যেগুলোতে দলের অনুমোদন লাগে। তাই দলের নির্দেশ মেনেই আমাকে কাজ করতে হবে। কিন্তু রুল ৩৭৭ বা প্রশ্নোত্তর পর্ব, দৃষ্টি আকর্ষণী সেশন, সেগুলোতে কোচবিহারকে নিয়ে কিছু বিষয় স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই বলবার মতো আছে। যেমন ব্রহ্মপুত্র বোর্ড— আমাদের উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা এর আন্ডারে রয়েছে। আছে ১০টি নদী— তিস্তা, তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকার ব্রহ্মপুত্র বোর্ডকে প্রচুর ফান্ডিং দেয় নদীগুলোর জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই বোর্ডে উত্তরবঙ্গ তো নয়ই, পশ্চিমবঙ্গেরও কোনও মেম্বার নেই। কেন নেই? কেন এই বঞ্চনা করা হচ্ছে? নদীগুলোর নাব্যতা কমে যাচ্ছে, ফি-বছর বন্যা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সেই ফান্ডিং নেই, যা দিয়ে রাতারাতি এসবের সুরাহা করবে। ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের তা আছে। বরাক উপত্যকায় বা আসামের বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে তারা ফান্ডিং করে, পশ্চিমবঙ্গ তার থেকে বঞ্চিত। এই আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে ২৫০০০ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে, সেই প্রস্তাবে কোনও সাড়া

উত্তরবঙ্গের ১০টি নদী— তিস্তা, তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকার ব্রহ্মপুত্র বোর্ডকে প্রচুর ফান্ডিং দেয় নদীগুলোর জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই বোর্ডে উত্তরবঙ্গ তো নয়ই, পশ্চিমবঙ্গেরও কোনও মেম্বার নেই। কেন নেই? কেন এই বঞ্চনা করা হচ্ছে? নদীগুলোর নাব্যতা কমে যাচ্ছে, ফি-বছর বন্যা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সেই ফান্ডিং নেই, যা দিয়ে রাতারাতি এসবের সুরাহা করবে।

পাওয়া যায়নি। এসব নিয়ে সংসদে বলবার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। সেই দপ্তরের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে যেমন চিঠি করা হয়েছে, তেমনই সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে এগুলো নিয়ে বলার ইচ্ছে রয়েছে। আমার স্বার্থে, আমার জেলার স্বার্থে আমি সংসদে কথা বলব। এই তিন মাসের মধ্যেই আমি প্রাইম মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড থেকে বারোজন দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি। সাংসদ হিসেবে অনেক কিছু করার জায়গা রয়েছে। আমি অবশ্যই তা করার চেষ্টা করব।

এখন ডুয়ার্স: আপনি এমপি হওয়ার পরে লোকসভার দু'-দুটো অধিবেশন হয়ে গিয়েছে, তার অভিজ্ঞতা কেমন?

পার্থপ্রতিম: পার্লামেন্ট তো গণতন্ত্রের পীঠস্থান, মন্দির-মসজিদ যা-ই বলুন না কেন। পার্লামেন্ট অনেক নতুন অভিজ্ঞতা সামনে আনে। বেশ কিছু বিষয়ে উপলব্ধি হয়। যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষ করে মোদি সরকার পার্লামেন্টকে এড়িয়ে বেশ কিছু কর্মসূচি নেওয়ার চেষ্টা করছে তা ভারতের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। আরবিআই একটা স্বশাসিত সংস্থা। একরকম তাকে এড়িয়ে 'নোটবন্দি'র মতো ইস্যুতে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী অনেকটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেন, সেটা ভারতের সংবিধানের পরিপন্থী। এসব ঘোষণা আরবিআই-এর গভর্নরের করা উচিত। ভারতের যা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, যেখানে ভারতের ইকনমির ৮৬ শতাংশ ৫০০/১০০০ টাকার নোটে হয়, যেখানে স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০ শতাংশও নয়, সেখানে কী করে পেটিএম বা অনলাইন ব্যাঙ্কিং সিস্টেম চালু করার কথা প্রধানমন্ত্রী বলেন তা আমাদের বোধগম্য হয় না। গুগ্‌ল-এর সিইও সুন্দর পিচাই যেখানে বলেছেন যে, আমাদের টেকনোলজি এখনও সেই জায়গায় পৌঁছায়নি, যেখানে নেট ব্যাঙ্কিং সিস্টেম চালু করা যায়। এ ছাড়াও মোবাইল ব্যাঙ্কিং কতটা সুরক্ষিত তা-ও

ভেবে দেখার বিষয়। কিছুদিন আগের এসবিআই-এর অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং-এর ঘটনা তারই প্রমাণ। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা দীর্ঘ আন্দোলন করছি। আমি তো সাংসদ হওয়ার পরই এই আন্দোলনে শামিল হয়েছি, সংসদের ভিতরে, সংসদের বাইরে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সামনে সরব হয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ কর্মসূচি নিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে গেলেই কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, সিবিআই-কে সুপ্রিম কোর্ট তোতা পাখি বলছে, আমরা সেখানে এসবের বিরোধিতা করছি। এক কথায়, রাজনীতির সেরা অভিজ্ঞতা হচ্ছে লোকসভায়। প্রচুর কাজ করার সুযোগ রয়েছে, সেগুলোকে এখন কাজে লাগাতে হবে।

এখন ডুয়ার্স: ভারতের সব থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে কোচবিহার একটি। দিল্লি থেকে এখানে পৌঁছাতে ৩০/৩২ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। বিমান যোগাযোগ নেই, এখন আপনি নিজেই যাতায়াতের সময় বুঝতে পারেন কতটা অসুবিধা হয়। আপনাকে একবার গৌহাটি থেকে বিমান ধরে দিল্লি যেতে হয়েছিল।

পার্থপ্রতিম: একটা সময় তো কোচবিহার থেকে নিয়মিত উড়ান চলত। একসময় বন্ধ হয়ে যায়। মাঝে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছে, বিভিন্ন কারণে তা ফলপ্রসূ হয়নি। রানওয়ে সম্প্রসারণ না-করা পর্যন্ত বিমান চালানো কোনওমতেই সম্ভব নয়। সেই সম্প্রসারণের কাজ এখন চলছে। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় অল্প সময়ের মধ্যেই তা বাস্তবায়িত হবে।

এখন ডুয়ার্স: নতুন লোকসভা নির্বাচন না-হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ২০১৯ সাল অবধি আপনার কার্যকাল চলবে। এর মধ্যে কী কী প্রস্তাব আপনি পার্লামেন্টে উত্থাপন করবেন বলে ভেবেছেন? কোচবিহারের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক ১০টি বড় প্রকল্পের প্রস্তাব করবেন বলে ভেবেছেন, তা আমাদের পাঠকদের জানাবেন?

পার্থপ্রতিম: প্রস্তাব তো আর এভাবে করা যায় না, পার্লামেন্টে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব তোলা যায়। আর বিভিন্ন দপ্তরে চিঠির মাধ্যমে জানাতে হয়। যেমন—
১) নদী নিয়ে আমার একটা চিন্তাভাবনা রয়েছে। তাই ব্রহ্মপুত্র বোর্ড নিয়ে আমার বক্তব্য থাকবে। এবার বোর্ডের বরাদ্দ যাতে আসে এবং উত্তরবঙ্গের নদীগুলোকে যাতে আমরা বাঁচাতে পারি, বন্যারোধে যাতে একটা মাস্টার প্ল্যান করা যায়, সেটা দেখব।

২) রাজবংশী ভাষাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আগামী দিনে আমরা চাই, রাজবংশী ভাষা কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিধানের অষ্টম তপশিলে আসুক। এই ভাষায় এখন যেসব খামতি রয়েছে, সেসব পূরণ করতে হবে। লিপির সমস্যা মেটানোর একটা উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। এখন থেকে যার মাতৃভাষা রাজবংশী, সে যাতে ফর্মে তা লিখতে পারে।

৩) কোচবিহারের ছিটমহলের মানুষদের মধ্যে যারা নব্য ভারতীয়, তাদের কর্মসংস্থান করতে হবে। তার জন্য একটা প্যাকেজ প্রয়োজন। কাঁটাতারের ওপারে কিছু মানুষ আছে, যাদের জীবন দুর্বিষহ। গেট খোলার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকার জন্য তারা কৃষিকাজটাও ঠিকভাবে করতে পারে না। সে ব্যাপারে কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪) আমাদের এখানে কিছু ভারী ও মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প গঠন করার জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এতে কর্মসংস্থানও বাড়বে।

৫) কোচবিহারের একটা অর্থকরী ফসল হল তামাক। কিন্তু অ্যান্টি টোব্যাকো মুভমেন্টের জন্য তামাক চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু তামাককে শুধু নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার না করে সেটা দিয়ে কী করে রং বা ওযুধ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, সেটা নিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের দিনহাটায় রয়েছে টোব্যাকো রিসার্চ সেন্টার। এ নিয়ে ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে কথা বলেছি। জেলা প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে যৌথভাবে বসতে চাই। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব দিতে চাই, যাতে তামাক নিয়ে একটা বিকল্প ভাবনাচিন্তা করা হয়। যাতে তামাক চাষিরা বাঁচতে পারে। পাটকে নিয়েও ভাল উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের চকচকাতে যে শিল্প তালুক আছে, সেটাকে যাতে আপগ্রেড করা যায়। এবং সঙ্গে কর্মসংস্থান। আমাদের যোগাযোগব্যবস্থার ইতিমধ্যেই কিছুটা সুরাহা হয়েছে। রেলের ডাবল লাইনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, বেশ কিছু বরাদ্দ এসেছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। আমি রেল কর্তাদের সঙ্গে মিটিং-এ বেশ কিছু প্রস্তাব দিয়েছি। এ ছাড়াও উড়ানব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে যোগাযোগে আরও সুবিধা হবে। এতে শিল্পের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুবিধা হবে।

৬) কোচবিহার জেলা জুড়ে যে হেরিটেজ ছড়িয়ে রয়েছে, তার বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ দরকার। এটার জন্য বরাদ্দ প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারকে এটা করতে হবে।

৭) পর্যটন নিয়ে একটা ভাবনা রয়েছে। এটাকে আরও চাঙ্গা করতে হবে। কোচবিহারে এত দেখার বিষয় রয়েছে, যেগুলোকে নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করলে কোচবিহার বিশ্ব মানচিত্রে নিজের জায়গা করে নেবে।

৮) বিভিন্ন সময় বন্য প্রাণীরা রেললাইনে কাটা পড়ে। এমন কিছু পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে বা কোনও সেন্সর বসাতে হবে, যাতে রেললাইনে হাতি বা অন্য বন্য প্রাণী এলে ড্রাইভার বুঝতে পারে এবং থেমে যায়।

৯) রাজ্য সরকার কোচবিহারে মেডিক্যাল কলেজ করার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য আমরা যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছি, সকলে পাশে দাঁড়াতে চাই। সাংসদ হিসাবে নিশ্চিতভাবে আমাদের কিছু করার আছে।

১০) শিশু এবং নারী পাচার বিষয়ে সকলকে সচেতন করতে হবে। বিভিন্ন হোম নিয়ে যে ইস্যুগুলো উঠে আসছে, সেই হোমগুলোর প্রতি জেলা প্রশাসন, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার যাতে ত্রিবিধ নজরদারি করতে পারে, তারা যেন কোনও ম্যাল প্র্যাকটিসের সঙ্গে যুক্ত না হয়, সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গেও যেমন কথা বলব, তেমন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও কথা বলব। এই বিষয়গুলো সংসদে তুলতে চাই, বিশেষ করে শিশু পাচার— এসবের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে পড়ছে মানুষ। তাদেরকে কীভাবে এসব থেকে বার করে আনা যায় তা ভাবতে হবে।

এখন ডুয়ার্স: আপনাকে তো দলের অনুশাসন মেনে চলতেই হয়। কিন্তু কিছু কিছু সময় দেখা যায়, আপনার মতো শিক্ষিত লোককে ধর্মসংকটে পড়তে হয়। একদিকে দলের কথা বা নির্দেশ মানতে হয়, অন্য দিকে থাকে নিজের মনের কথা। সেই সময় আপনি কীভাবে চলেন?

পার্থপ্রতিম: প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট থাকে। আমিও একজন রাজনৈতিক দলের কর্মী। দলের সত্যিকারের কর্মীরা তার বাইরে যেতে পারে না। আমার দলের যা মতাদর্শ, যা স্ট্যান্ড পয়েন্ট, তাকে আমায় মান্যতা দিতেই হবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কিন্তু এখানে কোনও জায়গা নেই। আমি একজন সাংসদ— একটা দলের প্রতিনিধি। তাই দলের নির্দেশ আমাকে মানতেই হবে। তেমন কোনও অসুবিধা হলে অবশ্যই তা দলের ভিতরে বলব। উপযুক্ত নেতৃত্বদের কাছে পরামর্শ চাইব।

এখন ডুয়ার্স: রেল নিয়ে গত দু'বছর আমাদের ডুয়ার্সে উন্নতি হয়েছে। তার জন্য কিন্তু আলাদা করে কোনও রেল মন্ত্রীর

দরকার পড়েনি। এই প্রথম আমরা দেখলাম, পশ্চিমবঙ্গে কোনও রেলমন্ত্রী নেই, অথচ উত্তরবঙ্গে রেলের প্রচুর কাজ হচ্ছে। আপনার কি মনে হয় না যে, একজন সাংসদ হিসেবে এই কর্মকাণ্ডে বেশ বড় ভূমিকা নিয়ে রেলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আরও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারেন?

পার্থপ্রতিম: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল মন্ত্রী থাকাকালীন আমাদের এখানে রেলের উন্নতির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ব্রডগেজ লাইন করেছেন, ময়নাগুড়ি-যোগীঘোপাসহ অনেক প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছিলেন। বর্তমান সরকার সেই টাকার বরাদ্দ দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব চিন্তা করেছিলেন, সেগুলো যদি ১০০ শতাংশ পূর্ণ হত তাহলে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গ ভারতের রেল মানচিত্রে একটা আলাদা জায়গা করে নিতে পারত। এটা পূরণ করতে আমরা সমর্থ হইনি। আগামী দিনে আমি সংসদে এই নিয়ে সরব হব, যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ভাবনাটা একশো শতাংশ বাস্তবায়িত হয়।

এখন ডুয়ার্স: কলেজ রাজনীতিতে অন্য দল করতেন শুনেছি। বিশ্ববিদ্যালয়েও।

পার্থপ্রতিম: কলেজে আমি রাজনীতি করিনি বললেই চলে। তবে দিনহাটা কলেজে আমাদের সময় তৃণমূল তিন-চারটে সিট পেয়েছিল। ২০০২-য় ইউনিভার্সিটিতে যাই। সেই সময়টা ওখানে একটাই সংগঠন ছিল— এসএফআই। আমি ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলাম। বিশেষ করে আমার ডিপার্টমেন্টে। খুব খোলাখুলি বলি, তখন একটা চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতি ছিল। কিছু মানুষ সেখানে কামতাপুরি রাজ্য, কামতাপুরি মানসিকতায় বেড়ে উঠেছিল। বেশ কিছু রাজবংশী ছেলে সেই আন্দোলনে জড়িয়ে যায়। আমরা রাজবংশী সম্প্রদায়ের ছেলে ছিলাম বলে আমাদের উপরও একটা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল, যদিও আমরা সেই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলাম না। সেই জায়গা থেকে নিজের অজান্তেই আমি আমার ইংরেজি বিভাগে সিআর মনোনীত হই। সেই থেকে রাজনীতিতে জড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু মতাদর্শগতভাবে সেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না।

এখন ডুয়ার্স: রাজ্যের শিক্ষার মানের এত অবনতি হচ্ছে কেন? শিক্ষার রাজনীতিকরণ, অধঃপতন যা-ই বলি না কেন, তা বাম-আমলেই শুরু হয়েছিল— কথাটা যেমন সত্যি, তেমনই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এখনকার একজন প্রাইমারি স্কুল টিচার ইংরেজি ছেড়েই দিন, বাংলাটাও ঠিকমতো জানেন না।

আপনাদের ছ'বছরে শিক্ষার এই অবস্থার উন্নতি করতে পারলেন না কেন?

পার্থপ্রতিম: এ কথায় আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা কখনওই সর্বজনীন হতে পারে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ভগ্নপ্রায় শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে এগচ্ছে, একটা জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের সময় ড্রপ আউট কমেছে। স্বাধীনতার ১০ বছরের মধ্যে ভারতের সংবিধানে সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার কথা ছিল, ৭০ বছরেও তা হয়নি। আমাদের সরকার পশ্চিমবঙ্গের বুকে বেশ কিছু নতুন প্রকল্পকে কার্যকরী করে সেই বাস্তবায়নের পথে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন ডুয়ার্স: কলেজে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এই ছাত্র রাজনীতির নামে চলতি রাজনীতির অনুপ্রবেশ কি শিক্ষা প্রাঙ্গণকেই দূষিত করছে না?

পার্থপ্রতিম: যে দিন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন, এই নিয়ে রাজ্য সরকার বিকল্প ভাবনা করছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিশ্চিতভাবে আগামীতে তা ফলপ্রসূ হবে। একদিনে তা ঠিক হবে না। তবে এইসব ঘটনাও কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সব জায়গায় হচ্ছে না। কয়েকটি কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে এগুলো ঘটছে। আমাদের দল, আমাদের সরকার এ ব্যাপারে খুব কঠোর। তারা বলেছে, ছাত্র রাজনীতি ছাত্ররাই করবে। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ যদি জড়িয়ে পড়ে, তবে দল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। এবারের কলেজ নির্বাচনে দু'-একজন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নিয়েছে, আপনারা তা সকলেই জানেন। আগামীতে কলেজ রাজনীতি থেকে দুর্বৃত্তায়ন জাতীয় শব্দগুলো মা-মাটি-মানুষের সরকারই পারবে নিশ্চিহ্ন করতে। তবে দেখুন, এর আগে এর চেয়েও অনেক বেশি ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটত। কিন্তু সেসব তেমনভাবে প্রচারের আলোয় আসেনি। মিডিয়ার ফোকাস ছিল না তেমন। তাই মানুষ জানতেও পারত না। আবার এই সময় অনেক ক্ষেত্রে মিডিয়াও অনেক কিছু তৈরি করে।

এখন ডুয়ার্স: স্কুল শিক্ষকদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কি আপনি সমর্থন করেন? আপনি নিজে তো একজন শিক্ষক। আপনার কি মনে হয় না যে, একজন স্কুল শিক্ষককে রাজনীতি করতে হলে ছুটি নিয়ে বা উইদাউট পে-তে করা উচিত?

পার্থপ্রতিম: দেখুন, আমাদের সংবিধানে

অনেক প্রভিশন আছে। আমরা আইন বা সংবিধানের বাইরে নই। যখন এই প্রভিশন থাকবে না, শিক্ষকরা রাজনীতি করতে পারবেন না, তখন নিশ্চয়ই করবেন না। আর ভারতের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, তাতে আমি মনে করি, প্রত্যেকটা সেগমেন্ট থেকে প্রতিনিধিত্ব থাকা ভাল। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকরা বাদ যাবেন কেন? তাঁরা রাজনীতি করলে অসুবিধাটা কোথায়? আমি শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি। আমাদের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, পড়ানোর পর বাকি সময়টা যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁরা সক্রিয় রাজনীতি করতে পারেন। তাতে কোনও বাধা নেই।

এখন ডুয়ার্স: দলের নেতৃত্ব আসামের সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়েছে। কেমন লাগছে?

পার্থপ্রতিম: নেত্রী আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, দল আমাকে উপযুক্ত ভেবেছে, আমি চেষ্টা করব সেই দায়িত্ব ১০০ শতাংশ পালন করতে। যেহেতু কোচবিহার জেলার একদম নিকটবর্তী রাজ্য আসাম, সেই হিসেবে আমাকে দেখার জন্য বলেছে। সেখানে আরও ক'জনকে সহযোগী হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছে— গৌতম দেব, দশরথ তিরকে, সৌরভ চক্রবর্তী— এরাও দেখবে। আমার জেলার বিভিন্ন নেতৃত্বরও পরামর্শ নেব। চেষ্টা করব, আমাদের সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি যাতে আসামেও করা যায়।

সাক্ষাৎকার: তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

গেল বছর পুজোর আগে গোরুমারা এলাকায় টলিউডি ছবির শুটিং টিমের অনভিপ্রেত বচসায় জড়িয়ে পড়ার ফল হিসেবে ভুগতে হয়েছে লাটাগুড়ির সাধারণ বাসিন্দাদের, যা ডুয়ার্সের মানুষের সেন্টিমেন্টে খানিক হলেও আঘাত করেছিল। সেই আঘাতেই স্বস্তির মলম লাগিয়ে গেলেন টলিউডের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ও ডুয়ার্সের অতিপরিচিত অতিথি কৌশিক গাঙ্গুলি, সম্প্রতি তাঁর নতুন ছবির লম্বা শুটিং চলল গোরুমারার নানা প্রান্তে। বলাই বাহুল্য, যাবতীয় ব্যথা ভুলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন স্থানীয় মানুষ, আর তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন স্বয়ং পরিচালকমশাই।

গোরুমারায় ফের টলিউড!

এবারের ছায়াছবি ডুয়ার্সে পর্যটন প্রসারে কাজে লাগবে?

হঠাৎ করেই একদিন বন্ধুবর কৌশিকের ফোন। মানে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলি। আবার ও গোটা একটা ছবির আউটডোর লোকেশন হিসেবে উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও ডুয়ার্সকেই বেছে নিয়েছে। পুরো ছবিটি ও এদিকে বসেই বানাবে। আমি লক্ষ করেছি, যখনই কৌশিক ছবির চিত্রনাট্য লিখতে বসে, তখন পাহাড় আর জঙ্গলটা ওর মাথায় থাকে। ভীষণ রকমের ভালবাসে ডুয়ার্সের জঙ্গল। গোরুমারা আর তার আশপাশের সমস্ত গ্রাম, পাহাড়, নদী, বনবস্তি ওর নখদর্পণে। গত পনেরো বছর ধরে ওর ডুয়ার্স বেড়ানোর সঙ্গী আমিও। কখনও আমরা দু'জন, কখনও আরও কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে, কখনও বা একদম পারিবারিক।

তবে এবার ও প্রথমে চেয়েছিল জলদাপাড়ার দিকে শুটিং করতে। কিন্তু আমি বললাম, তোমার এত প্রিয় জঙ্গল গোরুমারা বাদ যাবে কেন? আমার বায়না শেষ পর্যন্ত ও

এমন সুশৃঙ্খল ও ভদ্র জনগণ আগে কোথাও পাইনি। রোজ শুটিং শুরু হওয়ার আগে ওরা নিজেরাই ক্যামেরার পিছন দিকটায় গ্যালারির মতন করে বসে পড়ত। লাইন দিয়ে সামনের সারিতে বাচ্চারা, তারপর মহিলারা, তারপর পুরুষরা দাঁড়িয়ে থাকত। কারও মুখে একটা শব্দও থাকত না। কৌশিকের কথায়, আমাকে শুটিঙের মাঝপথে কখনও 'সাইলেন্স' কথাটি উচ্চারণ করতে হয়নি।

রেখেছিল। যথাসময়ে প্রায় একশোজনের ইউনিট নিয়ে চলে এসেছিল পাহাড় ও ডুয়ার্স দাপিয়ে শুটিং করবার জন্য। এবারের ছবির নাম 'ছায়া ও ছবি'। নামটাও দারুণ। ছোট্ট করে বলি, একটা ছবির শুটিং করবার জন্য একটা ইউনিট এল ডুয়ার্সে— সেটা নিয়েই পুরো ছবি। ছবিটা করবার আগে ও দু'বার ঘুরে গিয়েছে লোকেশন দেখার জন্য। আর লোকেশন তো ওর সবটাই জানা। তাই যখন ও গল্পটা লেখে, তখনই ওর মাথায় ছিল গোরুমারার কোন কোন অংশে শুটিং করবে। রেইকিতে আমাকে নিয়ে ও নিজের ঠিক করা জায়গাগুলোতেই ঘুরে এসেছিল। যেমন রামসাইয়ের কালীপুরে, ন্যাওড়া জঙ্গল ক্যাম্পের রাস্তায়, ধুপঝোরায় গাছবাড়িতে, চালসার গোরুমারা জঙ্গল ক্যাম্পের বিপরীতে, পঞ্চবটী ফরেস্ট রিসর্টের লনে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অলিখিতভাবেই এখন ডুয়ার্স দেশের অন্যতম ফিল্ম টুরিজম সার্কিট হিসেবে ঘোষিত। যদিও এখানকার ফিল্ম শুটিং থেকে এখনও সরকারের আয় বা রাজস্ব সংগ্রহের সেরকম কিছু ব্যবস্থা হয়নি, তবে ফিল্মে কোনও স্পটকে যদি তার নিজস্ব নামেই দর্শককে দেখানো যায় তাহলে পর্যটকের উৎসাহ বাড়ে, এতে পরোক্ষে পর্যটনশিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে।

দার্জিলিঙের কনকনে ঠান্ডায় দিনরাত তিন সপ্তাহ শুটিং করে নেমে সোজা গোরুমারায়। দলের বেশির ভাগ অংশই উঠল চালসায়। আর কৌশিক ও তার পরিচালনার দল, সঙ্গে কোয়েল মল্লিক, ঋত্বিক চক্রবর্তী, চূর্ণী গাঙ্গুলি-সহ বাকিদের ঠিকানা হল লাটাগুড়ির পঞ্চবটী ফরেস্ট রিসর্ট। এটা ওদের বরাবরের প্রিয় ঠিকানা। কৌশিকের কথায়, 'আমাদের দেশের বাড়ি।' এবার সবচেয়ে ভাল লাগল ওর যে কথাটা শুনে, সেটা শুটিং চলাকালীন বারবার বলছিল, আমি এই ছবিটা এমনভাবে করছি, যাতে ডুয়ার্সের পর্যটনশিল্পের প্রোমোশনে কাজে আসে। তাই হাতির পিঠে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চাপিয়ে শুট করবার প্ল্যানটাও ওর মাথায় ছিল। সেটা ও করে নিয়েছিল ধুপঝোরার এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে।

রোজ সকাল সাতটা থেকে ন'টার মধ্যেই ওদের কলটাইম থাকত। রাতে ফিরতে কখনও বারোটাও হয়ে যেত। এই ছবিতে রাতের দৃশ্য অনেকটাই রয়েছে। রামসাইয়ের কালীপুরে তাঁবু লাগিয়ে একটা পুরো গানের দৃশ্য তৈরি করা হয়েছিল, যা শুটিং করতে লেগেছে চার দিন, আর পুরোটাই রাতের দৃশ্য। সেখানে ঋত্বিক ও কোয়েলের দৃশ্য ছিল, স্বভাবতই আশপাশের বস্তি ও চা-বাগান এলাকার শয়ে শয়ে লোক এসে ভিড় জমাত ওদের প্রিয় নায়িকা কোয়েলকে হাতের কাছে পেয়ে। আর এবারের শুটিঙে ডুয়ার্সকে সবচেয়ে বড় শংসাপত্র কিন্তু দিয়ে গেল কৌশিক ও কোং। কৌশিকের নিজস্ব ভাষায়, আমি এ যাবৎ এত জায়গায় ছবির শুট করেছি, সর্বত্রই শুটিং দেখতে কমবেশি উৎসুকের ভিড় লেগেই থাকে, এবং তাদের সামলাতে বেগ পোয়াতে হয়। কিন্তু কালীপুরের শুটিং চলাকালীন যা অভিজ্ঞতা হল, এমন সুশৃঙ্খল ও ভদ্র জনগণ আগে কোথাও পাইনি। রোজ শুটিং শুরু হওয়ার আগে ওরা নিজেরাই ক্যামেরার পিছন দিকটায় গ্যালারির মতন করে বসে পড়ত। লাইন দিয়ে সামনের সারিতে বাচ্চারা, তারপর মহিলারা, তারপর পুরুষরা দাঁড়িয়ে থাকত। কারও মুখে একটা শব্দও থাকত না। কৌশিকের কথায়, আমাকে শুটিঙের মাঝপথে কখনও 'সাইলেন্স' কথাটি উচ্চারণ করতে হয়নি। এত লোক ভিড় করে শুটিং দেখত অথচ তা বোঝারই উপায় ছিল না। সবাই নিঃশব্দে এসে বসত, আর রাতে খাবার সময় হলে নিঃশব্দেই চলে যেত। কারও মুখে কোনও কথা, হাসাহাসি, আওয়াজ— কিচ্ছু নেই। কৌশিকের ভাষায়, তার শুটিং জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম। কৌশিককে যা খুবই ভাবিয়েছে। তাই বারবারই ঘুরে-ফিরে ওদের প্রশংসা করছিল। সত্যি কথা বলতে, আমারও ভীষণ গর্ব হচ্ছিল ডুয়ার্সের বনবস্তির ওইসব মানুষজনের কথা ভেবে।

আর-একটা লোকেশন ছিল গোরুমারার গাইড ধীরেনের বাড়ি। জঙ্গল লাগোয়া একটা বাড়ি, যেটা ছবিতে ঋত্বিকের বাড়ি হিসেবে দেখানো হয়েছে। পুরো বাড়িটা আর্ট ডিরেক্টর নিজের মতন করে বানিয়ে নিয়েছিল। ওই বাড়িতে দু'দিন ধরে রাতের বেলায় শুটিং হয়েছে। বাড়িটা তারপরেও ওভাবেই থেকে গিয়েছে। কাহিনিতে একটা জায়গা আছে— চারপাশে ঘন জঙ্গল, তার মাঝের রাস্তায় ছবির নায়িকা গাড়িতে করে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটা লেপার্ড এসে দাঁড়ায়, এবং গাড়ির উপরে লাফিয়ে উঠে পড়ে।

শুটিং পর্বের শেষ দিনের ঘটনা। ওদের চলে যাবার আগের দিন। অনেক রাতে শুটিং সেরে ফিরে সবাই পঞ্চবটীর লনে, ডাইনিং-এ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ পিছনের বনবস্তিতে পটকার আওয়াজ। রাত তখন একটা। সমবেত শোরগোল উঠল— হাতি এসেছে, হাতি এসেছে। কৌশিক, ঋত্বিক, কোয়েল, চন্দ্রাশিস, রাজদীপ— সব্বাই দে ছুট। গেটের পাশে রাস্তায় যদি মহাকাল দর্শন হয়, সেই আশায়! চারদিক নিকষ অন্ধকার, টর্চ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি, গ্রামের লোকের টিন বাজানো, হল্লা। কিন্তু শেষমেশ দর্শন না মিললেও খানিক উত্তেজনা তো হল!

এর পর রাত দুটোয় সবাই মিলে যখন ডাইনিং-এ খেতে বসা হল, কৌশিক বলে উঠল, পৃথিবীর এত জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু রাত দুটোয় ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত, কড়াই থেকে গরম গরম বেগুন ভাজা সোজা প্লেটে— এমনটা কেবল ডুয়ার্সে আর শুধু পঞ্চবটীতেই পেয়েছি। আর কখনও কোথাও পাইনি। তাই বারবার এখানে ফিরে আসা। প্রসঙ্গত, এর আগে এই গোরুমারায় বসে কৌশিক গাঙ্গুলি প্রচুর টেলিফিল্ম আর বেশ কিছু ফিল্ম বানিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত 'শব্দ', 'জ্যাকপট', 'খাদ', 'বাস্তুশাস্ত্র'।

অন্য পরিচালকদের যেমন প্রত্যেকবার অনুরোধ করি, কৌশিককেও এবার বলেছিলাম ছবিতে এখানকার স্থানীয় শিল্পীদেরও সুযোগ দিতে। তাই ঋত্বিক ও কোয়েলের ছোটবেলার দুটো চরিত্র ও বেছে নিয়েছিল শিলিগুড়ি থেকে। সেই চরিত্র

কোয়েল মল্লিকের সঙ্গে প্রতিবেদক

বাছাই নিয়েই একদিন এক কাণ্ড ঘটে গেল। শিলিগুড়িতে আমার বাড়ি থেকে সহকারীদের নিয়ে গাড়ি করে বেরিয়েছে, কিছুটা যেতেই রাস্তা দিয়ে একটা ছেলে যাচ্ছিল, যাকে দেখেই ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল। বলল, এমন একটা মুখই তো আমি খুঁজছিলাম। তক্ষুনি ড্রাইভারকে বলে গাড়ি ঘুরিয়ে ছেলেটিকে অনেক খোঁজা হল, কিন্তু আর পাওয়া গেল না। নাছোড়বান্দা কৌশিক বলল, তাহলে কোনও গলিতেই ও ঢুকেছে। এর পরও সবাই মিলে বহু খোঁজা হল এ বাড়ি-সে বাড়ি, কিন্তু ছেলেটা কোথায় যেন উবে গেল। এর পর কৌশিকের মুড অফ হয়েছিল বেশ কিছুক্ষণ।

এমন সব বিচিত্র ঘটনার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল ওর এবারের ছবি তৈরির কাজ। কৌশিক গাঙ্গুলির এই ছবির মধ্যে দিয়েই হয়ত আমরা পাব আরও সুন্দরী ডুয়ার্সকে। এখন অনেকেই ছবি তৈরি করতে আসছেন ডুয়ার্সে, বিশেষ করে গোরুমারায়। এদিকে এত ছবি তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে যে, পাহাড়-ডুয়ার্স মিলিয়ে ফিল্ম টুরিজম জমে উঠতে পারে চমৎকার। অলিখিতভাবেই এখন ডুয়ার্স দেশের অন্যতম ফিল্ম টুরিজম সার্কিট হিসেবে ঘোষিত। যদিও এখানকার ফিল্ম শুটিং থেকে এখনও সরকারের আয় বা রাজস্ব সংগ্রহের সেরকম কিছু ব্যবস্থা হয়নি, তবে ফিল্মে কোনও স্পটকে যদি তার নিজস্ব নামেই দর্শককে দেখানো যায় তাহলে পর্যটকের উৎসাহ বাড়ে, এতে পরোক্ষে পর্যটনশিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে। রাজ্যের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবকে এ ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করতে অনুরোধ করেছি। উনিও যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুটিং স্পটগুলিকে চিহ্নিত করতে। আসলে ডুয়ার্স যে সৌন্দর্যের খনি, এখানেই মেলে পাহাড়, জঙ্গল, নদী, চা-বাগান ও গ্রামবাংলার অসাধারণ ল্যান্ডস্কেপের মিশেল। অতএব আমাদের সদিচ্ছা পূরণ না হয়ে যায় কোথায়?

দীপজ্যোতি চক্রবর্তী

কোচবিহার নাটক-মূকাভিনয় উৎসবে শঙ্কর দত্তগুপ্ত স্মরণ

সম্প্রতি শেষ হল কোচবিহার ছায়ানীড় আয়োজিত 'নাটক ও মূকাভিনয় উৎসব ২০১৭'। এটি তাদের দ্বিতীয় বর্ষ ছিল। স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে এই নাট্যোৎসবের উদ্‌বোধন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক চিরঞ্জীব ঘোষ। তিন দিনের এই উৎসব সদ্যপ্রয়াত সাংবাদিক তথা প্রখ্যাত মূকাভিনেতা শঙ্কর দত্তগুপ্তর স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শঙ্কর দত্তগুপ্তর স্মৃতির উদ্দেশে নীরবতা পালন করা হয়। পরে তাঁর কন্যা সুকন্যার হাতে শোকপত্র তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশন অব ভলান্টারি ব্লাড ডোনারস-এর 'রক্তদাতা উদ্‌বুদ্ধকরণ বিষয়ক কোর্স'-এ ছায়ানীড়-এর হয়ে রাজ্যস্তরে চতুর্থ স্থানাধিকারী কৃতী ছাত্রী নন্দিতা মালাকারের হাতে পদক ও স্মারক তুলে দেওয়া হয়। প্রকাশিত হয় সংস্থার স্মারকগ্রন্থ। তিন দিনের এই উৎসবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং কলকাতার বিভিন্ন সংস্থা নাটক ও মূকাভিনয় পরিবেশন করে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

জলপাইগুড়িতে আবৃত্তি বিষয়ক কর্মশালা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত জলপাইগুড়ি বিভাগের আবৃত্তি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল গত ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭। তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালা চলেছে জলপাইগুড়ি ডিআরডিসি হলে।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই কর্মশালার শুভসূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক জগদীশ রায়, জেলার বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী আকাশ পালচৌধুরী প্রমুখ। মোট ৩০ জন শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনের প্রথমার্ধে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আবৃত্তিশিল্পের বিভিন্ন দিক (উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরচর্চা, শ্রুতিনাটক) নিয়ে শিক্ষার্থীদের আলোকপাত করেন।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রণতি ঠাকুর। তিনিও

বিস্তারিতভাবে আবৃত্তিচর্চার পদ্ধতি, মাইক্রোফোন ব্যবহার, উচ্চারণ, বোধ, ছন্দ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। দু'দিনেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, এবং প্রতি বছরই এইরকম কর্মশালা আয়োজনের দাবি ওঠে। শিবির শেষে শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

সীমা সান্যাল চৌধুরী

স্বপ্ন সফল শুরু সুস্মিতার

‘মনের অদম্য ইচ্ছের কাছে টাকাপয়সা বা অন্য যে কোনও প্রতিবন্ধকতা কোনও বাধাই নয়।’ চমকে উঠতে হয় সদ্য বাইশের কোঠায় পা-দেওয়া মেয়েটির জীবনবোধ দেখে। আর এই ইচ্ছের জোরেই হয়ত মেয়েটি পেরিয়ে

যাচ্ছে একের পর এক পথ, তা সে যতই দুর্গম হোক না কেন। সে সুস্মিতা ভৌমিক। জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডে আনন্দ চন্দ্র কমার্স কলেজের ঠিক উলটো দিকে যে ছোট্ট দোকানটিতে উপচে পড়ছে খবরের কাগজ আর স্থানীয় ও বাইরের পত্রপত্রিকা, সেই দোকানের মালিক ভবতোষ ভৌমিক। দোকানের পিছনেই গড়ে তুলেছেন তাঁদের অস্থায়ী আস্থানা। সেখানেই সস্ত্রীক তিনি তাঁদের একমাত্র মেয়ে সুস্মিতাকে রক্ত আর ঘামের বিনিময়ে গড়ে তুলেছেন একজন প্রকৃত শিল্পী রূপে। আর পাঁচটা বাবা-মা-র মতোই মেয়েকে গান, নাচ ও ছবি আঁকার ক্লাসে সেই ছোট্টবেলায় ভরতি করে দিয়েছিলেন। সম্বল বলতে ছিল একটা ছোট চায়ের দোকান। অর্থনৈতিক সমস্যা সত্ত্বেও

পাঠকের দাবিতে আবার শুরু হল জনপ্রিয় কলম ‘ডুয়ার্সের ডিশ’। এবার থেকে ডুয়ার্সের রাঁধুনিরা হাজির করবেন রন্ধনশৈলীর নানা এক্সপেরিমেন্ট। সূচনা করলেন **শ্রাবণী চক্রবর্তী**, যাঁর হাতের রান্নায় মমত্ব ও জাদু দুই-ই আছে।

আমিষ ধোঁকার ডালনা

উপকরণ

রুই মাছের পেটি ৬ টুকরো (সেদ্ধ করে কেটে ছাড়ানো); ডিম ১টি; জিরে, লংকা, হলুদ গুঁড়ো দেড় চা-চামচ করে; নুন আন্দাজমতো; আদা বাটা ১ চা-চামচ; রশুন বাটা ২ চা-চামচ; পেঁয়াজ বাটা ২ চা-চামচ; গরম মশলা আন্দাজমতো; তেজপাতা ২টি; গোটা জিরে ১ চিমটে; সাদা তেল ১/২ চা-চামচ; সরষের তেল ৫/৬ চা-চামচ; টক দই ১/২ কাপ।

প্রণালী

সেদ্ধ মাছের মধ্যে একে একে অল্প করে জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লংকা গুঁড়ো, নুন দিয়ে খুব ভাল করে মাখতে হবে। তারপর প্রথমে ডিমের সাদা অংশ দিয়ে মাখা মাছটিকে আবার মাখতে হবে। তারপর কুসুম দিয়ে দ্বিতীয়বার মাখতে হবে। একটি মুখবন্ধ বাক্সে ভাল করে সাদা তেল মেখে তার মধ্যে মাখা মাছটি রেখে ভাল করে কৌটোর মুখ বন্ধ করতে হবে। কড়াইতে জল দিয়ে গ্যাস অন করতে হবে। জল ফুটে উঠলে ওতে মুখবন্ধ মাছের কৌটোটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। ৫ মিনিট ফুটন্ত জলে থাকবার পর গ্যাস বন্ধ করে দিতে হবে। কৌটোটি ঠান্ডা হলে মুখ খুলে ফুলে ওঠা মাছটিকে কৌটো থেকে বার করে চারকোনা করে কেটে রাখতে হবে। কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে তেল গরম হলে মাছের টুকরোগুলো হালকা ভেজে তুলে নিতে হবে। ওই তেলে প্রথমে তেজপাতা, গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে একে একে আদা-রশুন বাটা দিয়ে খুব ভাল করে কষিয়ে নিতে হবে। কষানো থেকে যখন তেল বার হবে, তখন কুচোনো টম্যাটো, ১/২ কাপ ফেটানো টক দই, নুন ও সামান্য চিনি দিয়ে কষাতে হবে। তারপর ১ কাপ জল দিতে হবে। ঝোল ফুটে উঠলে মাছ ভাজার টুকরোগুলো দিতে হবে। একটু মাখা মাখা হলে গরম মশলা দিয়ে ঢেকে গ্যাস বন্ধ করে দিতে হবে। ভাত, রুটি, পরোটা যে কোনও কিছু দিয়ে খান। গ্যারান্টি দিচ্ছি, যাঁরা মাছ পছন্দ করেন না, তাঁরাও চেয়ে চেয়ে খাবেন।

পিছপা হননি তিনি। মেয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন তার স্বপ্ন গড়ার যাবতীয় উপাদান।

বাবা-মা-র অক্লান্ত পরিশ্রম, নিজের প্রতিভা, জেদ ও অধ্যবসায়কে সঙ্গী করে সেই মেয়ে আজ নিঃসন্দেহে জলপাইগুড়িসহ পশ্চিমবাংলার মুখ উজ্জ্বল করছে। জলপাইগুড়ি চিরকালই সাহিত্য-সংস্কৃতিতে একটা বিরাট জায়গা অধিকার করে আছে। শহর জুড়ে ছোটবড় অনেক নাচ, গান, কবিতা শেখানোর স্কুল। দর্জিপাড়ার 'নটনিক্বণ' সেগুলোরই অন্যতম, প্রশিক্ষক ঝিনুক রায় চক্রবর্তী। তাঁরই হাত ধরে সেই

ছ'বছর বয়স থেকে পথ চলা। নৃত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গেই চলে মণিপুরি শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রশিক্ষণ। খুব সহজেই গুরুমার নজর কাড়ে তার নৃত্যশৈলী। সুস্মিতা হয়ে ওঠে প্রিয় ছাত্রী। মণিপুরি নাচের পাশাপাশি গুরু থিঙ্গম ব্রজেন কুমার সিং-এর কাছে 'পুংবাদন' (মণিপুরি যন্ত্র) এবং 'থাংতা' (মণিপুরি নৃত্যশৈলী) শিখছে সুস্মিতা। এর পর আর পিছনে তাকানো নয়... সাফল্য বারবার ছুঁয়ে গিয়েছে সুস্মিতার কপাল। ২000 সালে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, ২০০৬-এ তা অন্য মাত্রা পায়। সিসিআরটি-তে স্কলারশিপের জন্য আবেদন জানায় সুস্মিতা। আর অভাবনীয়ভাবে সেবারই পেয়ে যায় এই জুনিয়র স্কলারশিপ, যা পাওয়ার জন্য বারবার পরীক্ষা দিয়েও ব্যর্থ হন অনেকেই। স্টেজ শো করার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জায়গায়, যেমন হায়দরাবাদ, শান্তিনিকেতনের সৃজনী শিল্পগ্রামে নাচের কর্মশালায় অংশগ্রহণও করে সুস্মিতা। সংস্পর্শে আসে স্বনামধন্য সব পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের। গুরু কলাবতী দেবী, গুরু বিপিন সিং-এর কেন্দ্র নর্তনালয়, গুরু সুচরিতা শর্মার দেবার্পণ কালচারাল সেন্টার-এর মতো আরও অনেক জায়গা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ডান্স ফেস্টিভ্যালে ডাক আসতে থাকে। এর সঙ্গেই চলতে থাকে চণ্ডীগড় প্রাচীন কলাকেন্দ্রে নাচের প্রথাগত পরীক্ষা। তারপরই আসে সেই খবর, যার জন্য সারাজীবনও কারও অপেক্ষা ফুরায় না। ২০১৭-র ৮ জানুয়ারি কলকাতার উত্তম মঞ্চে মাননীয় রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, কত্থক নৃত্যশিল্পী অমিতা দত্ত প্রমুখের উপস্থিতিতে সুস্মিতার হাতে তুলে দেওয়া হয় স্বর্ণপদক এবং শংসাপত্র। চণ্ডীগড় প্রাচীন কলাকেন্দ্রের সর্বোচ্চ স্তর নৃত্যে ভাস্কর ডিগ্রি পেয়ে যায় সুস্মিতা। এর পর ২০১৭-তেই আসে আরেকটি সুযোগ। ডিডি ভারতীতে নির্বাচিত হয় 'নটনিক্বণ'-এর দু'জন ছাত্রীর নৃত্যানুষ্ঠান। আর সে দু'জনের একজন যে সুস্মিতা তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই অনুষ্ঠানটি ডিডি ভারতীর সঙ্গে জানুয়ারি মাসে ডিডি ন্যাশনালেও প্রচারিত হয়। এই আন্তর্জাতিক উৎসবে বারোটি দেশের শিল্পীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করা যে কী ভীষণ গর্বের, আনন্দের তা সুস্মিতার চোখ দুটোতেই ঝরে পড়ছিল। এ যেন আরও এক স্বপ্নপূরণের গল্প।

কিছু কিছু গল্প আছে, যা কখনও ফুরায় না। সুস্মিতার গল্পটাও ঠিক এমনই। এখনও ওর দু'চোখ জুড়ে কত স্বপ্ন! নাচের জন্য উৎসর্গিত তার সম্পূর্ণ জীবন। তার জন্য যে কোনও আত্মত্যাগ করতে সে প্রস্তুত। বর্তমানে শিলিগুড়ির এসআইটি-তে পাঠরতা

বি টেক তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীটি চাকরির সঙ্গে নাচ নিয়েও কাজ করার সংকল্প নিয়েছে দৃঢ়ভাবে। অপেক্ষা করছে দিল্লিতে সদ্য পরীক্ষা দিয়ে আসা ইয়াং আর্টিস্ট স্কলারশিপ-এর জন্য। খুব গর্ব হয় ওর এই সংগ্রামের কথা জানতে পেরে। বাবা-মা-র সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বপ্নপূরণ করতে ভবিষ্যতে একটা নাচের স্কুল খোলারও পরিকল্পনা আছে ওর। কিন্তু এসবই সময়ের অপেক্ষা। এখন ও শুধু দৌড়াবে সাফল্যের দিকে... আলোর দিকে। আর একদিন না একদিন সেই কাঙ্ক্ষিত আলোটা ও ছুঁয়ে ফেলবেই। আমরা, ওর গুণমুগ্ধরা সেদিকেই তাকিয়ে থাকব।

শাঁওলি দে

দেবপ্রসাদ রায়

।। ২৮ ।।

ততদিনে রাজীবজীর সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠতার খবর হাওয়ায় ভাসতে শুরু করেছে। ফলে কাঁকড়ার রাজনীতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। একটা গ্রামের ছেলে বাংলার নেতাদের 'অনুমোদন' না নিয়ে দিল্লিতে নেতা হবে! বাংলার বাঘেদের তা সহ্য হবে না। নাই বা তারা ভোটে জিতলেন। নাই বা মানুষ গ্রহণ করুক, কিন্তু বাংলার নেতারা গ্রহণ না করলে দিল্লি কাউকে গ্রহণ করেছে— এই বার্তা যদি একবার সাধারণ স্তরে চলে আসে, তবে তো বাংলার নেতাদের 'মৌরুসি পাট্টা' শেষ হয়ে যাবে। তাই অল্প কিছু শুভানুধ্যায়ীকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চললেন লেখক। সেই সব অজানা কথা নিয়েই এবারের কিস্তি

রাজীবজিকে বলে তো এসেছিলাম, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপর একটা পরিকল্পনা জমা দেব। কিন্তু এখনকার মতো তখন বললেই কোনও পেপার তৈরি করা যেত না। কারণ, তথ্যপ্রযুক্তি তখন সম্পূর্ণ অজানা। চাইলেই রেফারেন্স পাওয়া যাবে, চাইলেই ডিটিপি করা যাবে— এগুলো তখন অসম্ভব, ভাবনার বাইরে ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, কাজটা গোপনে করতে হবে। কারণ, ততদিনে রাজীবজির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার খবর হাওয়ায় ভাসতে শুরু করেছে। ফলে কাঁকড়ার রাজনীতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। আরে! ও একটা গ্রামের ছেলে। আমাদের কাছ থেকে অনুমোদন না নিয়ে দিল্লিতে নেতা হবে! আমরা সব বাংলার বাঘ। না-ই বা ভোটে জিতলাম। না-ই বা মানুষ গ্রহণ করল। কিন্তু আমরা গ্রহণ না করলে দিল্লি কাউকে গ্রহণ করেছে— এ বার্তা যদি একবার সাধারণ স্তরে চলে আসে তাহলে তো আমাদের মৌরসিপাট্টা শেষ হয়ে যাবে। তাই প্রদেশ কংগ্রেসে বসে সেখানকার পরিকাঠামো ব্যবহার করে কিছু করা যাবে না। আবার রাজ্যে তখন খুব বেশি শুভানুধ্যায়ীও নেই, যার অফিসে বসে কাজটা তার পরিকাঠামো দিয়ে করিয়ে নেওয়া যাবে।

একজন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা সাদা পোশাকে আমার কাছে আসত। গুরু দত্ত। মনেপ্রাণে কংগ্রেসি। কিন্তু চাকরির স্পর্শকাতরতার জন্য কাউকে মন খুলে বলতে পারত না অভিমানের কথা, বৈষম্যের কথা। আমি ছিলাম তার নীরব শ্রোতা। একদিন হঠাৎ মনে হল, পুলিশের লোক। ওকে বললে একটা কোনও জায়গা খুঁজে বার করতে পারবে, যেখানে নিশ্চিন্তে বসে টাইপ করা যায়। কেউ জানবে না। বা মাঝে মাঝে বিরক্তও করবে না। আমি ইতিমধ্যে কনসেপ্ট পেপারটা লিখে ফেলেছি। হাতে লেখা তো আর দেওয়া যায় না। টাইপ করব কোথায়? আর করবে কে? বুলু তখন আমার খুব ঘনিষ্ঠ। আমার মতোই নেতার আশ্রয় থেকে 'কক্ষচ্যুত'। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, টাইপ করতে জানিস? ও বলল, পারি, তবে স্পিড কম। আমি বললাম, স্পিড না হলেও চলবে। কিন্তু কাউকে বলা যাবে না কী টাইপ করা হল। বুলু বলল, সে আর বলতে। কিন্তু কোথায় করব? আমার তো মেশিন নেই, আর পিসিসি-তে করা যাবে না। আমার ভরসা ছিল, গুরুদা একটা ব্যবস্থা করবেই। ঠিকই। দু'দিন পরে জানাল, খিদিরপুরে একজন এক্সপোর্টার আছে। তার অফিসে কাজটা করা যাবে। বিরক্ত করারও কেউ নেই। কোনও লোকের জানবারও কোনও সুযোগ নেই। ব্যাস। পরের দিন সকালবেলা আমি আর বুলু চলে গেলাম। খিদিরপুরে একটা গলির ভিতর অফিস। সারাদিন বসে কাজ করা হল। চা, খাবার— কোনও ত্রুটি নেই। 'কনসেপ্ট পেপার' রেডি হয়ে গেল। আমিও ঠিক করলাম, এবার দিল্লি গিয়েই জমা দিয়ে দেব।

কিন্তু দিল্লিতে তখন আমার জন্য এক অন্য পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। আনন্দ শর্মা ছিল হিমাচলপ্রদেশের যুব কংগ্রেস সভাপতি। মুখ্যমন্ত্রী রামলাল এর বিরোধী গোষ্ঠী বীরভদ্র সিংহের অনুগামী। আর রাজ্যসভা সদস্য উষা মলহোত্রা রামপালের ঘনিষ্ঠ এবং ইন্দিরাজির বাল্যকালের বান্ধবী। আনন্দ শর্মার ছোট ভাই অশোক শর্মা উষা মলহোত্রার মেয়েকে নিয়ে

পালিয়ে গিয়েছে। উষা মলহোত্রা কালবিলম্ব না করে ইন্দিরাজির কাছে এসে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। আনন্দ ওর পরিবারের এত বড় ক্ষতি করল! ওর মদত না থাকলে ওর ভাই এই দুঃসাহসিক কাজ করবার সাহস পেত না।

সেই সময়ে ইন্দিরাজির রাজনৈতিক সচিব মাখনলাল ফোতেদার। ইন্দিরাজি ফোতেদারকে বললেন, আনন্দকে ডেকে ওর কাছ থেকে পদত্যাগপত্র নিয়ে নাও। ফোতেদার সাহেব আনন্দকে ডেকে পাঠালেন। আনন্দ ভয়ে ভয়ে ১, আকবর রোডে ফোতেদার সাহেবের ঘরে গিয়েছে। উনি বললেন, 'বোসো।' তারপর একটা কাগজ আর কলম হাতে দিয়ে বললেন, 'এখানে বসে তোমার রেজিগনেশন লিখে দাও।' ওর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। সবে দল ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আর তখনই ওকে সরে যেতে হবে। ও বলল, 'স্যার, আমি এক মিনিট বাথরুম থেকে আসছি।' বেরিয়েই পড়ি কি মরি করে গুলাম নবির কাছে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'আমার কোনও দোষ নেই। আমাকে বাঁচাও। এসব রামলালের খেলা। অশোক আর ওর মেয়ের প্রেম অনেক দিনের এবং মা-বাবারাও জানেন। শুধু শুধু এটাকে হাতিয়ার করে আমাকে সরাতে চাইছে।'

গুলাম নবিও চিন্তিত। ম্যাডাম বলেছেন পদত্যাগপত্র নিয়ে নিতে, তারপর কে বাঁচাবে? কিন্তু আনন্দের চোখের জলও দেখা কঠিন। অনেক ভেবেচিন্তে রাজীবজিকে গিয়ে সব বলল। রাজীবজি বললেন, 'এখন মাম্মি যে মুডে আছে, ওঁকে কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। তুমি কাউকে পর্যবেক্ষক করে বিষয়টি সরেজমিন তদন্ত করতে পাঠাও। আর আমি মাম্মিকে সেই রিপোর্ট না-আসা পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।' সেই মুহূর্তে এর চেয়ে ভাল পদক্ষেপ আর কিছু হতে পারে না।

কে যাবে! সেই ডি পি রায়। আমি কালকা মেল ধরব রাত ১০টায়। আনন্দ স্টেশনে এসে আমাকে তুলে দিয়ে বলল, 'দাদা, তোমার হাতেই আমার সবকিছু নির্ভর করছে। আমার আর কিছু বলার নেই।' আমি বললাম, 'গোটা ব্যাপারটাই তো তোমাকে বাঁচানোর জন্য। কাজেই ঘাবড়াবার কী আছে?' সব মিলিয়ে তিন দিন ছিলাম। এ কথা না বললে ভুল হবে যে, সে সময়ে গোটা যুব কংগ্রেসটাই আনন্দের পক্ষে ছিল। তবে মনে রাখার মতো কথা বলেছিলেন বীরভদ্র সিং সাহেব। তিনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'ইট ইজ নট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, হু ইজ অন ট্রায়াল, ইট ইজ অ্যান আইডিয়োলজি, দ্যাট ইজ অন ট্রায়াল।'

আনন্দ শর্মা

গুলাম নবিও চিন্তিত। ম্যাডাম বলেছেন পদত্যাগপত্র নিয়ে নিতে, তারপর কে বাঁচাবে? কিন্তু আনন্দের চোখের জলও দেখা কঠিন। অনেক ভেবেচিন্তে রাজীবজিকে গিয়ে সব বলল। রাজীবজি বললেন, 'এখন মাম্মি যে মুডে আছে, ওঁকে কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। তুমি কাউকে পর্যবেক্ষক করে বিষয়টি সরেজমিন তদন্ত করতে পাঠাও। আর আমি মাম্মিকে সেই রিপোর্ট না-আসা পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।'

যা-ই হোক, আমি তিন দিন ধরে হিমাচলের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে যুব কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছিলাম, অশোকের ঘটনাকে ছুতো করে রামলাল গোষ্ঠী বীরভদ্র সিংহকে দুর্বল করতে চাইছে। আর বীরভদ্র সিংহের জনপ্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। যেখানেই গিয়েছি, রাজা সাহেবের নাম নিয়ে একটা উন্মাদনা লক্ষ করেছি। এবং আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার কাজটা যদি অন্যরকম হত! রাজ্যে কার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত? আমি নিঃসন্দেহে সুপারিশ করতাম, রামলালের বদলে বীরভদ্র সিংহকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করা হোক।

যা-ই হোক, আমি ফিরে আসবার পরই হঠাৎ এক ভদ্রলোক এলেন দেখা করতে। মাঝবয়সি। বললেন, 'আমার নাম রাজকুমার কন্ডেল। আমি তখন সিমলায় ছিলাম না, তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আমিও কিছু বলতে চাই।' আমি বললাম, 'তাতে অসুবিধা কী! বলুন, আমি তো শুনতে রাজি।' কন্ডেল বলল, 'এখানে নয়। আপনাকে আমি এক জায়গায় নিয়ে যাব। একজন বড় শিল্পপতি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। তবে অবশ্যই লাঞ্চে বসে।' অর্থাৎ আমাকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন কন্ডেলের মাধ্যমে। এখনও পর্যন্ত কোনও শিল্পপতির সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। সভাপতি, ভগ্নীপতিতেই সীমাবদ্ধ ছিলাম, তাই একটু কৌতূহল হল। বললাম, কোথায় যেতে হবে? কন্ডেল বলল, মোহননগর। তখনও বুঝিনি, কে ডাকছে।

নির্ধারিত দিনে ওর সঙ্গে মোহননগর যাওয়া হল। যে প্ল্যান্টে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল, সেটা মোহন নিকিন্স-এর প্রধান কার্যালয়। অফিসঘরে বসার পর কন্ডেল একটু ভিতরে গিয়ে পরক্ষণেই এসে বলল, 'চলুন, লাঞ্চ রেডি।' ভিতরে ডাইনিং হলে গিয়ে দেখলাম, ডাইনিং কাম বিলিয়ার্ড রুম। এক ভদ্রলোক পিছন ফিরে বিলিয়ার্ড খেলছেন। টেবিলে খাবার সাজানো। নিরামিষ। আমি ঢুকতেই উনি ফিরে দাঁড়ালেন। 'আইয়ে রায় সাহাব, মুছে কপিল মোহন কহতে হ্যায়।' বুঝলাম ইনিই মালিক। খাওয়া শুরু হল। উনি বললেন, 'সঞ্জয়জি বেঁচে থাকলে তোমাকে কষ্ট দিতাম না। কারণ একদিনেই আমি আনন্দকে বদলে দিতাম। আজ উনি নেই, ফলে ওকে সরাবার জন্য তোমাদের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। আমি চাই আনন্দ চলে যাক। কন্ডেল ভাল ছেলে। আমি ওকে সাহায্য করব। তুমি তোমার রিপোর্টে কন্ডেলের নাম প্রস্তাব করে জমা দাও। তারপর আমি দেখছি।' বোঝা গেল, অশোক নিমিত্তমাত্র। চক্রান্ত অনেক গভীরে। অনেকে হয়ত মনে করতে পারবেন, একসময় 'সোলান-ওয়ান' বিয়ারের একচেটিয়া বাজার ছিল এবং কপিল মোহন দেশের অন্যতম প্রধান 'লিকার ব্যারন' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আমার বীরভদ্র সিংহের উক্তিটা মনে পড়ে গেল।

খেয়ে ফিরছি। দেখলাম আনন্দ মুখ ভার করে অফিসে বসে আছে। আমাকে দেখেই বলল, 'কপিল মোহনের সঙ্গে লাঞ্চ করে এলে?' আমি বললাম, তাতে কী? 'ডিনার' তোমার সঙ্গে করে তারপর রিপোর্ট ফাইনাল করব।

আনন্দকে বাঁচানো তো গেল। কিন্তু রাজ্য সভাপতির পদ ছাড়তে হল। ওকে জাতীয় স্তরে সাধারণ সম্পাদক করে নিয়ে আসা হল অর্থাৎ আমার কলিগ হয়ে এল। তবে ও

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 15,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

জানত, আমার রিপোর্ট ওর পক্ষে ছিল বলেই ওর পুনর্বাসন হয়েছে। ফলে আমরা আরও কাছাকাছি হয়ে পড়লাম। গুলাম নবি সভাপতি হওয়াতে বয়সের কারণে পানিক্কর এআইসিসি-তে সম্পাদক হয়ে চলে গিয়েছে। তার ফলেও আনন্দের সঙ্গে সখ্য বাড়ছিল। কারণ আমরা দু'জনেই হোল টাইমার। এবং দু'জনেই ঘর ছেড়ে দিল্লিতে এসে থাকছি। পরবর্তীতে আমরা তিন বছর ৭০, সাউথ অ্যাভিনিউতে একসঙ্গে ছিলাম। সে আর-এক গল্প।

যা-ই হোক, সে সময় এসওয়াইএল ক্যানেলের জল নিয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার ভিতর টানাপোড়েন চলছিল। হরিয়ানাকে শতদ্রুর জল দেওয়ার প্রশ্নে আকালি দলের বিরোধ ছিল। পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সরকার দরবারা সিং মুখ্যমন্ত্রী। হরিয়ানায় ভজনলাল। ক্যানেলের জল ছাড়ার উপলক্ষে পাঞ্জাবের সীমান্ত এলাকায় একটা বড় জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন ইন্দিরাজি। দু'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা থাকবেন। কেন্দ্রের গৃহমন্ত্রী জ্ঞানী জৈল সিংও থাকবেন। খবর ছিল, আকালি গোলমাল করবে। রাজীবজি আমাকে আর আনন্দ শর্মাকে ডেকে পাঠালেন— 'তোমরা তিন দিন আগে পাঞ্জাব চলে যাও। ওখানে দেখতে হবে, প্রধানমন্ত্রীর মিটিং-এ যেন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।' তাঁর নির্দেশে আমরা গেলাম। স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয় করে কী করে ভিড় করার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়ে, আশপাশের এলাকা থেকে লোক আসে তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিলাম। শেষ পর্যন্ত সভা নির্বাচিত দিনে নির্বিঘ্নেই হয়ে গেল। কেবল আকালি-র মহিলা মোর্চা সভাস্থল থেকে বেশ দূরে অবস্থান মঞ্চ করে লাগাতার স্লোগান দিচ্ছিল, 'সাড়ে হক, ইথথে রখ।' যেহেতু কেবল দূর থেকে মাইকে একটা স্লোগানের আওয়াজ ভেসে আসছিল, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেনি।

ট্রিপটা শেষ পর্যন্ত একটা মধুর অভিজ্ঞতায় পরিণত হল। পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে বিনোদ শর্মার ফাইভ স্টার হোটেল। পিকাডেলিতে তিন দিন থাকা। বিকেলে স্থানীয় 'পত্রকার'দের সঙ্গে আলাপচারিতা ও আড্ডা আর মাঝে মাঝে সভা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রস্তুতি দেখতে যাওয়া। পশ্চিমবাংলায় আমরা এ ধরনের বিলাসবহুল রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। ফলে আমার মনে হল, প্রতি মাসেই কেন এরকম একটা অ্যাসাইনমেন্ট আসে না!

অবশ্য পরে একবার একটা এ ধরনের আরও গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছিলাম। জৈল সিংজির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। সে দিন আমি রামদার ৭০, নর্থ অ্যাভিনিউয়ের বাড়ির ছাদে শুয়ে আছি। কারণ ঘরে প্রচণ্ড গরম। রাত ১০টা নাগাদ জর্জের ফোন এল। ভিনসেন্ট জর্জ ছিল রাজীবজির ব্যক্তিগত সচিব। আমাকে বলল সকাল ৫টায় এয়ারপোর্ট চলে যেতে। একজন টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। চণ্ডীগড় গিয়ে, ওখান থেকে বাই রোড সিমলা গিয়ে রামলালের কাছ থেকে জৈল সিং-এর মনোনয়নপত্রে সই করিয়ে আনতে হবে, কারণ আগে উনি যে প্রস্তাবটায় সই করেছিলেন, জৈল সিং ভুল জায়গায় সই করায় ওটা বাতিল হয়ে যাবে। ঘুমের বারোটা বাজল। ৫টায় এয়ারপোর্ট মানে

হরিয়ানাকে শতদ্রুর জল দেওয়ার প্রশ্নে আকালি দলের বিরোধ ছিল। পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সরকার দরবারা সিং মুখ্যমন্ত্রী। হরিয়ানায় ভজনলাল। ক্যানেলের জল ছাড়ার উপলক্ষে পাঞ্জাবের সীমান্ত এলাকায় একটা বড় জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন ইন্দিরাজি।

৪টেয় বাড়ি ছাড়তে হবে। অর্থাৎ রাত ৩টেয় উঠে তৈরি হতে হবে। ঠিক করলাম, ঘুমাব না। একসময় কালী পুজোর প্যান্ডেল করবার জন্য রাতের পর রাত জেগেছি। একটা রাত না ঘুমালে কী যায়-আসে।

যথাসময়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেটেই টিকিট নিয়ে দাঁড়ানো রাজীবজির ব্যক্তিগত সচিব জর্জকে দেখা গেল। চণ্ডীগড় থেকে বাই রোড সিমলা। মুখ্যমন্ত্রীর নিবাসে গিয়ে বোঝা গেল, আমার আসার খবর আগেই দেওয়া ছিল। উনি বাড়িতেই ছিলেন। তখন দুপুর। আমি স্বাক্ষর নিয়ে আবার চণ্ডীগড়। বিকেল ৬টার ফ্লাইট ধরে ৭টার ভিতর ২এ, মোতিলাল নেহরু মার্গে গিয়ে কাগজ জমা দিলাম। একটু শ্লাঘাও হল। দেশের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে আমারও একটা ছোট ভূমিকা থেকে গেল। তার চেয়েও বড় কথা, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে আমি করতে পারি বা নেতৃত্ব মনে করছে আমি যোগ্য, তাতে আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল।

(ক্রমশ)

অরণ্য মিত্র

কাহিনিতে এল দেবমালা যাদব। কেন সে দেখা করতে এল কনক দত্তের সঙ্গে? শরীরের বিনিময়ে টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু তৃপ্তির কথা ভাবতে গিয়ে এবার কোন খেলায় নামতে চাইছে মনামী? ক্যাভেন্ডিস গেছে গোয়ায় গুর্মুখ সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে। বুদ্ধ ব্যানার্জিকে নিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনে কী বললেন গুর্মুখ? রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে চালু হতে যাওয়া ব্ল্যাক বেঙ্গলের পতাকা এবার নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছে ডুয়ার্সের অপরাধ জগৎ। ক্যাভেন্ডিসের ভাগ্যে তবে মারিজুয়ানা প্রোজেক্ট? আরো বিচিত্র পথে যাচ্ছে কাহিনি—তারই ঈঙ্গিত এবার।

।।৮২।।

দু'দিন হল পয়লা বৈশাখ গিয়েছে। কন্যাসাথি এনজিও-র ব্যাপারে আর কোনও তথ্য হাতে আসেনি কনক দত্তর। কেসটা যেন ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে এরই মধ্যে। যোগেশ নামের খোঁচড়টা সেই যে পাঁচশো টাকা নিয়ে খবর দেবে বলে হাওয়া হয়েছে, কনক দত্ত আর তাকে দেখেননি। খবরের অভাবে ইচ্ছে থাকলেও কনক দত্তকে কাটাতে হচ্ছে অলস সময়। একটু আগে তিনি বাজার থেকে জলঢাকার বোরোলি মাছ কিনে বাড়ি ফেরার পর মধ্যযুগের ভারতে কী ধরনের অপরাধ হত, সে বিষয়ে একটা বই খুলে পাতা ওলটাচ্ছিলেন। দিনটা বেশ গরম। পাতা ওলটাতে ওলটাতে ঝিম ধরে যাচ্ছিল তাঁর। সেটা কেটে গেল একটা গাড়ির শব্দে। সাদামাটা একটা গাড়ি এসে থেমেছে বাড়ির সামনে। একজন সে গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলে ঢুকছে।

আগন্তুক একটি মেয়ে। লম্বা, ছিপছিপে গড়ন। ছোট চুল। গায়ের রং পরিষ্কার। হালকা গোলাপি টি-শার্ট আর কালো প্যান্ট পরনে। গাড়িটা সে নিজেই চালিয়ে এসেছে।

কনক দত্ত বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মেয়েটা তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে বাংলায় বলল, 'আমি কনক দত্তর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'আমিই। ভিতরে আসুন।'

বসার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েটা বলল, 'আমার নাম দেবমালা যাদব। তবে আমার মা বাঙালি।'

'ঠান্ডা কিছু খাবেন? বেলের শরবত?'

'কিচ্ছু না।' দেবমালা যাদব হাসল। কনক দত্ত বুঝতে পারলেন, মেয়েটি বেশ সুন্দরী। চেহারাতে ভরপুর আত্মবিশ্বাস রয়েছে।

'আমি আইপিএস পাশ করে সাত বছর চাকরি করেছিলাম ওড়িশায়। তারপর একটা সিক্রেট সার্ভিসে জয়েন করি। এখনও সেখানেই আছি। ইচ্ছে আছে, ভবিষ্যতে নিজে একটা সিক্রেট সার্ভিস এজেন্সি খুলব।'

'খুব ভাল।' কনক দত্ত খুশি হয়ে বললেন, 'কিন্তু আমার কাছে আসার কারণ কি সিক্রেট সার্ভিসের হয়ে কোনও ইনফর্মেশন নেওয়া?'

'ইয়েস স্যার।'

'কোন ব্যাপারে?'

'ডুয়ার্সে চাইল্ড অ্যান্ড উয়োম্যান ট্রাফিকিং নিয়ে একটা ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। রাজ্যের একজন প্রভাবশালী নেতা এ ব্যাপারে আমাদের পার্সোনাল অনুরোধ করে জানিয়েছেন যে, আমরা যেন আপনার কোঅপারেশন গ্রহণ করি। তবে তাঁর নাম জানতে চাইবেন না।'

‘তদন্ত কি শুরু করেছেন?’

‘ইন ফ্যাক্ট, আমি এক মাস হল শিলিগুড়িতে আছি।’ দেবমালা বলল, ‘ডুয়ার্সে একটু নতুন টিম তৈরি হতে যাচ্ছে। বেশ কিছু অভিজ্ঞ অপরাধী যোগ দিচ্ছে সেই টিমে। এরা বিভিন্ন টিমে ছিল।’

‘দলটার নাম কি ব্ল্যাক বেঙ্গল?’ কনক দত্ত সামান্য হেসে বললেন কথাটা। দেবমালা অবাক হল, ‘আপনি নামটা জানতেন?’

‘দেখুন ম্যাডাম, বুদ্ধ ব্যানার্জিকে ফাঁদে ফেলা প্রায় অসম্ভব বলে আমার ধারণা।’ কনক দত্ত উঠে দাঁড়ালেন, ‘সে ক্ষেত্রে ব্ল্যাক বেঙ্গলকে আপনারা কতটা ধরতে পারবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ডুয়ার্সের অপরাধজগতে বুদ্ধ ব্যানার্জি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে যাচ্ছেন। মনে হয় না আপনারা সফল হবেন।’

‘আই নো দ্যাট।’ দেবমালা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, ‘বুদ্ধ ব্যানার্জি নিজে খুব সাধারণ জীবনযাপন করেন। অপরাধজগৎটা তাঁর নেশা। তাঁকে ট্র্যাপ করা খুব কঠিন। কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলকে গোড়া থেকে দুর্বল করতে না পারলে ট্রাফিকিং বন্ধ করা যাবে না ডুয়ার্সে।’

কনক দত্ত জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, ‘আপনারা কদ্দূর এগিয়েছেন?’

‘ব্ল্যাক বেঙ্গলে যোগ দিয়েছে এমন একজন জলপাইগুড়িতে আছে। নাম শুক্লা দাস।’

কনক দত্তর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

।। ৮৩।।

ক্যাভেন্ডিসের খপ্পর থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বিধ্বস্ত মুনমুনকে কিছু দিনের জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল সুরেশ কুমার। সেই ঘটনার পর কাজকর্মও স্থগিত রেখেছিল। তার পরামর্শ মেনে সুষমাও বন্ধ রেখেছিল নিজের অনলাইন এসকর্ট সার্ভিসের ব্যবসা। ‘শকুন্তলা’র কাজও পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় বেশ কিছুদিন স্বেচ্ছায় ঘরবন্দি হয়ে খেয়ে-ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিল মনামি। মাঝে একবার মা-বাবার সঙ্গে নেপাল বেরিয়ে এসেছে। মুনমুনকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলেও সুষমা আছে শিলিগুড়িতেই। কিন্তু সে-ও প্রায় ঘরবন্দি। আসলে খুব দরকার না পড়লে একা একা তাদের বাইরে বার হতে নিষেধ করে দিয়েছিল সুরেশ কুমার।

কিছুদিন হল সুরেশ কুমারও বেপাত্তা। সুষমার কাছ থেকে ফোনে মনামি জেনেছিল যে, ক্যাভেন্ডিসকে ফলো করে বিশেষ লাভ হয়নি। যদিও ক্যাভেন্ডিসকে নিয়ে কোনও আগ্রহ ছিল না মনামির, কিন্তু তাঁর শাগরেদ

মনামি টের পায় যে, তার শরীরের একটা নিজস্ব খিদে আছে। সে খিদে এসকর্ট সার্ভিসে দেহ বিলিয়ে কিংবা ক্যামেরার সামনে রতিক্রিয়ার অভিনয় করে মেটানো যায় না। এর জন্য একটা নিজের পুরুষ প্রয়োজন। কোনও বিশেষ সম্পর্ক নয়, কেবল একটি শরীরের একান্ত সঙ্গী। সাময়িক, কিন্তু নিজের। ফ্রি সেক্স কনসেপ্ট যেমন শরীরের বিনিময়ে কোনও কিছু দেওয়া-নেওয়ায় বিশ্বাস করে না, তেমন একটা সম্পর্ক।

মুনমুনের যে অবস্থা করেছিল, সেটা জানার পর লোকটাকে খুন করার ইচ্ছে হয়েছে তার। তবে কয়েকদিন আগে সুষমা একটা বিচিত্র কথা জানিয়েছে। সুরেশ কুমার সমেত তারা সবাই নাকি একটা নতুন দলের হয়ে কাজে নামবে। দলটার নাম ব্ল্যাক বেঙ্গল। দলটা বুদ্ধ ব্যানার্জির।

বুদ্ধ ব্যানার্জির বিষয়ে মনামির খুব একটা ধারণা ছিল না। তবে সিনেমার পত্রিকায় সে লোকটার ছবি দেখেছে। বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গেও ছবিতে দেখা যায় তাকে। রাজনীতির লোক। বিধানসভার সদস্য। সুষমার কথা সত্যি হলে সেই বুদ্ধ ব্যানার্জিই নাকি দল বানিয়েছেন। অবশ্য এইসব জানার পরেও ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে সে খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি। সুষমা যেখানে কাজ করবে, সেটাই যে তার কাজের জায়গা, সে কথা জানিয়ে দিয়েছে সে। তবে সেই দলের প্রথম মিটিং হবে পঁচিশে বৈশাখ। এটা শুনে বেশ মজা লেগেছিল মনামির। তার মা-বাবা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। তাঁরা প্রায়ই বলেন, তিনি সবখানেই আছেন। মিটিং-এর তারিখটা জানলে নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যেতেন।

শিলিগুড়িতে আজ বেশ গরম। নিজের ঘরে টানা এসি-তে থাকতে থাকতে ভাল লাগছিল না মনামির। সেটা অফ করে দিয়ে ঘরের জানলা খুলে দিয়ে সে আবিষ্কার করল, বাইরে ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে এবং শিলিগুড়ির ধূসর আকাশ ছেয়ে ফেলছে মেঘ। মনামি ঠিক করল ছাদে গিয়ে বসবে। ছাদটা তার প্রিয় জায়গা ছিল। কিন্তু এসব কাজে জড়িয়ে পড়ার পর অনেকদিন সে ছাদে গিয়ে বসে না। তাদের ফ্লোর থেকে ছাদে যেতে মোটে দুটো তলা উঠতে হয় বলে মনামি ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ধরল। কিন্তু কয়েক ধাপ ওঠার পর মোড় ঘুরতেই থমকে গেল সে। উলটো দিক থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে এক চমৎকার নবীন পুরুষ। মেরুন ট্রাউজার আর হালকা হলুদ টি-শার্টে ঢাকা সুগঠিত শরীরে শক্তির প্রাচুর্য। চোখ দুটো ভাসা ভাসা।

মনামি টের পায় যে, তার শরীরের একটা নিজস্ব খিদে আছে। সে খিদে এসকর্ট সার্ভিসে দেহ বিলিয়ে কিংবা ক্যামেরার সামনে রতিক্রিয়ার অভিনয় করে মেটানো যায় না। এর জন্য একটা নিজের পুরুষ প্রয়োজন। কোনও বিশেষ সম্পর্ক নয়, কেবল একটি শরীরের একান্ত সঙ্গী। সাময়িক, কিন্তু নিজের। ফ্রি সেক্স কনসেপ্ট যেমন শরীরের বিনিময়ে কোনও কিছু দেওয়া-নেওয়ায় বিশ্বাস করে না, তেমন একটা সম্পর্ক। কিন্তু তেমন কোনও পুরুষের সন্ধান পাচ্ছিল না সে।

এখন তার মনে হল, সে পেয়ে গিয়েছে।

ছেলেটিও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মনামির পুরোটা একবার দেখে নিয়ে সে হেসে বলল, ‘হাই। আমি সৌরভ।’

‘আমি মনামি। এই বিল্ডিং-এ থাকি। ফিফ্থ ফ্লোর।’

‘আমিও তো সেই ফ্লোরেই থাকি। ফাইভ-ডি। মনসুখানির অপোজিট ডোর।’ বলতে বলতে নেমে এসে হাত বাড়িয়ে দিল সৌরভ। সুন্দর একটা গন্ধ পেল মনামি। ছেলেটার কি গার্লফ্রেন্ড আছে?

‘আগে তো দেখিনি আপনাকে!’ গলায় বিস্ময় এনে বলল মনামি, ‘একাই থাকেন নাকি?’

‘হ্যাঁ। আসলে আমি ফোটোগ্রাফার। ফ্ল্যাটটা আমার চাচাজির। আমাদের ফ্যামিলি কালিম্পঙে থাকে। আমি ডুয়ার্স নিয়ে একটা কাজ করব বলে শিলিগুড়িতে থাকছি। তবে আমরা কিন্তু পাঞ্জাবি। ইউ আর বেঙ্গলি, আই থিঙ্ক।’

‘আপনার বাংলা শুনলে তো পাঞ্জাবি মনেই হয় না।’ মনামি হাসল, ‘হাতে সময় আছে? ছাদে যাচ্ছিলাম।’

‘ও ইয়েস!’ সৌরভ বোধহয় এমন প্রস্তাব আশা করেনি। তাকে বেশ অবাক এবং খুশি দেখাল, ‘আমার বাংলা ভাল, কেন কী আমার বাবা বেঙ্গলি মিডিয়ামে পড়ে এনবিইউ থেকে এম কম করেছিলেন।’

‘আই লাইক ফোটোগ্রাফি।’ সিঁড়িটা যথেষ্ট চওড়া। মনামি ইচ্ছে করেই সৌরভের শরীর ঘেঁষে হাঁটছিল। ছাদে গিয়ে রেলিং-এর

সামনে পাশাপাশি দাঁড়াল যথাসম্ভব ব্যবধান কম রেখে। একটু একটু করে গল্প করতে করতে ক্রমশ জেনে নিল প্রার্থিত তথ্য। দার্জিলিঙের এক বড় মাপের নেপালি ব্যবসায়ীর একমাত্র মেয়ের প্রতি দুর্বলতা আছে সৌরভের। একসঙ্গে কফি খাওয়া আর সিনেমা দেখাও হয়েছে তাদের। তবে মেয়েটির ফ্যামিলি খুব রিজার্ভড। ভাসমান মেঘের প্রবাহ দেখতে দেখতে সৌরভ তাই একটু হতাশার সুরে বলল, 'আই ডিডন্ট টাচ হার।'

স্পর্শের জন্য সৌরভ কতটা উদ্‌গ্রীব, সেটা পরখ করার জন্য মনামি নিজের বাহু দিয়ে আলতো চাপ দিল তার হাতে। সৌরভ সরে গেল না। সম্ভবত সামান্য চেষ্টাতেই দার্জিলিং নিবাসী প্রিয়তমার প্রতি তার আগ্রহ দূর করে দিতে পারবে সে।

'আপনি চাইলে আমি আপনার ফ্ল্যাটে এসে গল্প করতে পারি। ইন ফ্যাক্ট, আমিও বন্ধুর অভাবে খুব বোর হয়ে যাই মাঝে মাঝে।' আড়চোখে সৌরভের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল মনামি, 'অবশ্য ব্যাপারটা ঠিক হবে না, তা-ই না?'

'কেন?' সৌরভ তাকাল। তার মুখে বিরহের আর কোনও চিহ্ন নেই। তার বদলে বিস্ময় মেশানো জিজ্ঞসা, 'আপনি এলে আমি খুব খুশি হব। কবে আসবেন বলুন?'

মনামি তখনই কোনও জবাব না দিয়ে কেবল সৌরভের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে একবার অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

।। ৮৪ ।।

গোয়ার একটি অভিজাত রিসর্টের বারান্দায় বসে গুর্মুখ সিং বিয়ার খাচ্ছিলেন। সামনে উন্মুক্ত বেলাভূমি ও সমুদ্র। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনটি উপভোগ করতে করতে তিনি অপেক্ষা করছিলেন ক্যাভেন্ডিসের জন্য। খুব জরুরি দরকার না থাকলে ডুয়ার্স থেকে গোয়ায় ছুটে এসে গুর্মুখ সিং-এর হলিডে মেজাজে বিঘ্ন ঘটাবার লোক ক্যাভেন্ডিস নয়। এই ছেলেটাকে দিল্লি হাই-এর ভবিষ্যৎ বলে মনে করেন গুর্মুখ সিং। কলকাতা থেকে ফ্লাইট ছাড়তে দেরি হওয়ায় ক্যাভেন্ডিসের আসতে দেরি হচ্ছে। তবে যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে।

গুর্মুখ সিং অবশ্য অনুমান করেছেন ক্যাভেন্ডিসের ছুটে আসার কারণ। কিন্তু তার মুখে সেটা না-শোনা পর্যন্ত তিনি কোনও সিদ্ধান্তে আসতে চাইছেন না। আরও আধ ঘণ্টা বিয়ারে চুমুক দিয়ে সমুদ্র দেখার পর তাঁর নজরে এল, ক্যাভেন্ডিস আসছে। রিসর্টের একজন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে।

'ওয়েলকাম ডিয়ার ফ্রেন্ড!' সাদর আহ্বান জানিয়ে বললেন গুর্মুখ সিং। তারপর হিন্দিতে কুশল জিজ্ঞাসা করে, দু'-একটা লঘু কথা আলোচনা করে, আরও আধ গেলাস বিয়ার উদরস্থ করে, মুখ মুছে বললেন, 'এবার কাজের কথা বলো। এত জরুরি কী ঘটল? কিছু খাবে?'

বিমানবন্দর থেকে ক্যাভেন্ডিস সোজা এখানে এসেছেন। তিনি এক কাপ দার্জিলিং চায়ের ইচ্ছে প্রকাশ করে হাতের ব্যাগটা একপাশে রেখে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'বুদ্ধ ব্যানার্জিকে নিয়ে আমার কমপ্লেন আছে। সিরিয়াস ম্যাটার।'

'কিন্তু এগজিকিউট কমিটির কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করার কোনও রাইট তো তোমার নেই।' গুর্মুখ সিং মাথা দুলিয়ে হাসলেন, 'তুমি যা বলবে তা অফিশিয়াল হবে না। তবে আমি ইম্পর্টেন্স দেব। বুদ্ধ ব্যানার্জি কী করেছে?'

'বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু ডুয়ার্সে উনি কাজের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ফ্রিডম নিচ্ছেন। অর্গানাইজেশনকে ইগনোর করেছেন। ইন ফ্যাক্ট, ডুয়ার্সে দিল্লি হাই-এর অ্যাকটিভিটিজ প্রায় জিরো। যা হচ্ছে, সেটা বুদ্ধ ব্যানার্জির পার্সোনাল ইন্টারেস্টের জন্য। অর্গানাইজেশনের কোনও লাভ হচ্ছে না।'

'ব্যানার্জিকে ওর স্টেটের এক পাওয়ারফুল লিডার ফাঁদে ফেলার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে।' শান্ত গলায় বলতে লাগলেন গুর্মুখ সিং, 'সে এখন সেফ থাকার জন্য যা করবে, পুরোটাই নিজের কন্ট্রোলে রেখেই করবে। তুমি কি তার সঙ্গে কনফ্রন্টেশনে যেতে চাও?'

'তা না হলে ডুয়ার্স আর নর্থ-ইস্টে আমরা সেকেন্ডারি হয়ে যাব।'

'কিন্তু ডুয়ার্সে তার বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমে সফল হওয়া খুব কঠিন। এর জন্য অর্গানাইজেশন তোমাকে অতিরিক্ত কোনও সাপোর্ট দেবে না।'

'কিন্তু ব্যানার্জি বিজু প্রসাদকে মেরেছে। নবীন রাইকে ডুয়ার্সছাড়া করেছে। বিজু প্রসাদ ওয়াজ অ্যান অ্যাসেট।'

'অ্যান্ড হি উইল ট্রাই টু টারমিনেট ইউ।' ক্যাভেন্ডিসের উত্তেজিত মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন গুর্মুখ সিং, 'বাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ ইউ। বুদ্ধ ব্যানার্জির মতো ট্যালেন্টেড এবং পুরনো ফ্রেন্ডকে নিয়ে অন্য কিছু ভাবার আগে ভাল করে ভাবতে হবে ক্যাভেন্ডিস। তুমি আগ বাড়িয়ে তার শত্রু হতে যাচ্ছ কেন? স্টপ অল অ্যাকটিভিটিজ ইন ডুয়ার্স। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড অবজার্ভ দ্য সিচুয়েশন। ব্যানার্জির দলের নাম ব্ল্যাক বেঙ্গল, তা-ই তো?'

'ইয়েস স্যার।'

'সে ডার্ক ক্যালকাটা নামে একটা গ্রুপ প্রোডিউস করে আমাদের কিছুদিন ভুল বুঝিয়েছিল। এটা কতটা দক্ষতার পরিচয় ভেবে দেখো ক্যাভেন্ডিস। ইন্ডিয়াতে দিল্লি হাই-এর মতো দলকে মাসের পর মাস ঘোল খাওয়ানো সোজা কাজ নয়। এর থেকে ব্যানার্জির নিজস্ব নেটওয়ার্কের একটা ধারণা পাওয়া যায়। আমাদের হয়ে সে চিনা স্যাটেলাইট ফোনের ডিল করে মাল নিয়ে নিয়েছে। অবশ্য এর জন্য দিল্লি হাই-এর অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও পে করতে হয়নি। বাট হি ম্যানেজড দ্য হোল অ্যালোন।'

'কিন্তু ডার্ক ক্যালকাটা স্যার ব্যানার্জির তৈরি নয়। এটা কোনও একজন এমপি নিয়ন্ত্রণ করত। আমাদের বিরোধী রেজিমেন্টের কেউ। গোড়াতে তারা আমাদের বিরুদ্ধে সত্যিই নেমেছিল। ব্যানার্জিও জানতেন। কিন্তু দলটাকে নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে নিয়েছিলেন। এটা স্যার আমাদের সংবিধানে বিশ্বাসঘাতকতা।'

'এর হিসেব পরে কোরো ক্যাভেন্ডিস।' সমুদ্রের দিকে চোখ ফিরিয়ে উদাস গলায় বললেন গুর্মুখ সিং, 'তুমি চাইলে ডুয়ার্সে মারিজুয়ানা চাষের প্রোজেক্ট করতে পারো। এখানে ব্যানার্জি নাক গলাবে না। তুমি ডুয়ার্সে এটা স্বাধীনভাবে করতে পারবে। কিন্তু ব্যানার্জির সঙ্গে আপাতত কম্প্রোমাইজ করতে না চাইলে তুমি ডুয়ার্স ছেড়ে দাও। দক্ষিণ ভারতে ম্যাজিক মাশরুম বিক্রির পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য তোমাকে আমরা চেন্নাই পাঠিয়ে দেব।'

ম্যাজিক মাশরুম এক ধরনের ছত্রাক, যা অবিশ্বাস্য নেশা সৃষ্টি করে। চোখের সামনে পৃথিবীকে আশ্চর্য সব রঙে ভরে যেতে দেখে সেবনকারী। সঙ্গে স্বর্গীয় অনুভূতি ফাউ। একবার এই বস্তু গ্রহণের খরচ কম করে হাজার তিরিশ। ভারতে বিত্তশালী পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ম্যাজিক মাশরুমের চাহিদা প্রতিদিন বাড়ছে। কেবল চেন্নাইতেই পঞ্চাশ কোটির ব্যবসা হতে পারে বলে দিল্লি হাই-এর অনুমান। মাদক আর নারীশরীর— এই দুটোই আগামীতে ইন্ডিয়ান ক্রাইম ওয়ার্ল্ডের মূল নিশানা।

কিন্তু ক্যাভেন্ডিস বলল, 'আমি ডুয়ার্সেই কাজ করতে আগ্রহী। সাময়িকভাবে আপস করা যেতেই পারে।'

গুর্মুখ সিং খুশি হলেন। পরিস্থিতির কারণে বুদ্ধ ব্যানার্জিকে এই মুহূর্তে ছাড় দিয়ে চলতে হবে। ব্যানার্জির সঙ্গে বন্দোবস্ত করেও ডুয়ার্স আর নর্থ-ইস্টে কাজ চালাতে পারে দিল্লি হাই। কিন্তু ঝামেলায় গেলে পুরোটাই লস। ব্যানার্জি আলাদা চিজ। আমেরিকায় জন্মালে এফবিআই-কে কাঁদিয়ে ছাড়ত নির্ঘাত!

(ক্রমশ)

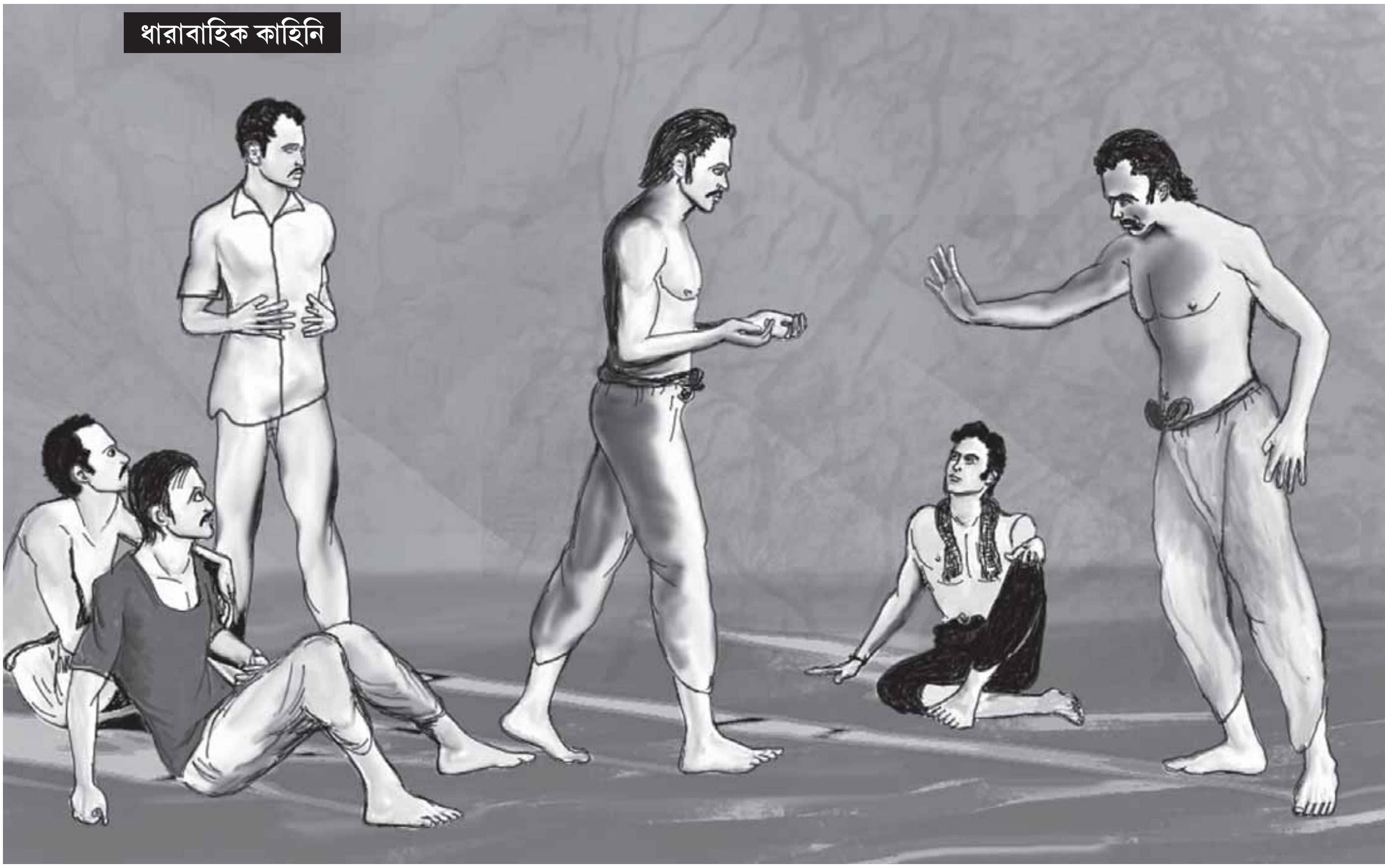

উৎরাই তরাই

।। ৪২ ।।

ভরা বর্ষার দুটো মাস বাদ দিলে টাউনের আর্য নাট্যসমাজে ফি-হপ্তায় শনি-রবিবার থিয়েটার হয়। টাউনের বাবুরা এসে ভিড় জমান শো দেখার জন্য। থিয়েটারের আগে আর পরে বেশ খানিকক্ষণ গল্পগুজব সেরে বাড়ি ফেরেন। এখন অবশ্য বৃষ্টির দিন বলে আগামী এক মাস থিয়েটার বন্ধ। তবে বাইরের বড় মাঠে নবদ্বীপ থেকে আসা একটা দল তাঁবু খাটিয়ে ক'দিন হল অপেক্ষা করছে। আবহাওয়া একটু পরিষ্কার হলে আর্য নাট্যের মঞ্চ ভাড়া নিয়ে 'ভীষ্মের শরশয্যা' শুরু করবে। সঙ্গে ফাউ হিসেবে এক ঘণ্টার পালা 'আমার দেশ'।

লোকে বলে, জলপাইগুড়ি টাউনে একবার গিয়ে হাজির হতে পারলে থাকা-খাওয়া নিয়ে অত ভাবতে হয় না। আত্মীয় হলে তো কথাই নেই, নিদেন পক্ষে জেলার কোনও লোকের দূর সম্পর্কের যে কেউ হলেও ঠাঁই একটা জুটে যায়। পদবি মিলে গেলে তো কথাই নেই। বৃন্দাবন সরকার সেটা বিলক্ষণ টের পাচ্ছেন। বার্নেশ জংশনে ট্রেন থেকে নেমে ভরা তিস্তা নৌকোয় পেরিয়ে কাছারির ঘাটে নেমে প্রথমেই খোঁজ করেছিলেন বিপুল উকিলের। বৃন্দাবনের বাড়ি বিক্রমপুরে। বিপুল উকিল তাঁদের গ্রামের লোক না হলেও এলাকার লোক তো বটেই। কাজের কথা জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন বৃন্দাবন। পত্রপাঠ জবাব এসেছে চলে আসার জন্য। সেই চিঠি আর একটা টিনের বাক্সে সামান্য জামাকাপড় আর পনেরোটা টাকা নিয়ে কাছারির ঘাটে নেমেছেন বৃন্দাবন।

বেলা সবে ন'টা। সামনেই বড় ঘাট। গাড়ি-ঘোড়া-লোকজন-কুলি-মজুর-মাঝিমাল্লায় চারদিক মুখর। কল্লোলিত তিস্তার ঘোলা জল বেয়ে যাওয়া-আসা করছে প্রচুর নৌকো। কাছারির সামনেটা অবশ্য ফাঁকা। আদালত এখনও খোলেনি। দুটো বিহারি কুলি মুখোমুখি উবু হয়ে বসে কলকে টানছিল। বৃন্দাবন সরকার ভাবলেন, তাদের কাছে পথটা জেনে নেবেন। বিপুল উকিল লিখেছিলেন যে, কাছারি থেকে তাঁর বাড়ি এক ক্রোশেরও কম পথ। সুতরাং হেঁটেই যাওয়া যাবে।

তখনই পাশ থেকে কে জানি হাঁক দিয়ে বলল, 'মশাই কি নতুন নাকি?'

বৃন্দাবন পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁরই বয়সি এক যুবক হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সচ্ছল ঘরের ছেলে। হাতে সিগারেটের টিন।

'নতুন মানে, এই প্রথম পা দিচ্ছি এই শহরে।' বৃন্দাবন হেসে জবাব দিলেন, 'আমার নাম বৃন্দাবন সরকার।'

'সরকার?' যুবকের মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটে ওঠে। এগিয়ে এসে বলে, 'তাহলে তো হয়েই গেল। আমার নাম বীরেশ। আমিও সরকার।'

ব্যাস। বৃন্দাবন সরকার তারপর থেকে দিন পনেরো হল বীরেশের অতিথি হয়ে দিন কাটাচ্ছেন শহরে। বিপুল উকিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি বলেছেন, কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বীরেশদের পুরনো কাঠের বাড়ির পাশের জমিতে নতুন দালান উঠেছে। তাদের অনেকরকম ব্যবসা। ব্যাঙ্ক আর চা-বাগানের শেয়ার আছে প্রচুর। বৃন্দাবন সরকার তাদের পুরনো বাড়ির একটা ঘরে থাকছেন আপাতত। সারাদিন টাউনে ঘুরে বেড়ান এবং সন্ধের পর বীরেশের সঙ্গে দাবা খেলেন। বীরেশের দুই ছেলের সঙ্গেও বেশ ভাব জমেছে তাঁর। একটা কিছু জুটে গেলে নিজের বউ-বাচ্চাকে নিয়ে জলপাইগুড়ি থাকার কথা ভেবে ফেলেছেন তিনি।

দাবা খেলার পাশাপাশি থিয়েটারের প্রতি একটু দুর্বলতা ছিল বৃন্দাবনের। এর মধ্যেই কয়েকবার আর্য নাট্য ঘুরে এসেছেন। এখনও সেভাবে আলাপ হয়নি সদস্যদের সঙ্গে। তবে আর্য নাট্যের একটা যুব দল আছে। তারা টাউনের গেরস্ত বাড়িতে বিয়ে-অন্নপ্রাশন-শ্রাদ্ধের কাজে হাজির হয়ে নানা কাজে হাত লাগিয়ে সহযোগিতা করে। সে দলের অন্যতম পান্ডা ভবেশ কোনও কারণে বীরেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তখন বৃন্দাবন আলাপ করেছিলেন তার সঙ্গে। ছোকরাটি ভাল। চেহারা সুন্দর। আর্য নাট্যের হয়ে সখীর অভিনয় করে।

সেই ভবেশের সঙ্গেই আর্য নাট্যের মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃন্দাবন সরকার। সামনেই করলা নদী। গতকাল রাতে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। টিনের চালের নিচে শুয়ে বৃন্দাবনের মনে হচ্ছিল, সেটা ভেঙে পড়বে। আর্য নাট্য এবং তার পাশে ব্রাহ্মসমাজের মাঠের জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে। মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তাটা কাদায় ভরতি। কয়েকটা বাচ্চা মাঠের জলে চ্যাপটা পাথর ছুড়ে ব্যাং নাচাচ্ছিল।

তাঁবু খাটিয়ে বসা রাধামাধব অপেরার অধিকারী সনাতন দাস মিহি গলায় জানতে চাইছিলেন, আগামী শনি-রবি শো করা সম্ভব হবে কি না। ভবেশ তাঁকে আশ্বস্ত করে

দাবা খেলার পাশাপাশি থিয়েটারের প্রতি একটু দুর্বলতা ছিল বৃন্দাবনের। এর মধ্যেই কয়েকবার আর্য নাট্য ঘুরে এসেছেন। এখনও সেভাবে আলাপ হয়নি সদস্যদের সঙ্গে। তবে আর্য নাট্যের একটা যুব দল আছে। তারা টাউনের গেরস্ত বাড়িতে বিয়ে-অন্নপ্রাশন-শ্রাদ্ধের কাজে হাজির হয়ে নানা কাজে হাত লাগিয়ে সহযোগিতা করে।

বলল, 'ওয়েদার মনে হচ্ছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দাদা। আজকের দিনটা দেখুন। তারপর হ্যান্ডবিল ছাপাবেন। তবে আপনাদের দেশের ডাক শুনে আবার পুলিশ চলে আসবে না তো?'

'না না!' সনাতন দাস মিহি সুরে যতটা সম্ভব জোর এনে বললেন, 'আমরা ডিরেক্ট কিছু দেখাচ্ছি না। শুনেছি টাউনের পরিস্থিতি খুব উত্তপ্ত। নেতারা প্রায় সকলেই জেলে গিয়েছেন। পালায় যেখানে যেখানে কংগ্রেস কথাটা ছিল, বাদ দিয়ে দিয়েছি।'

'দেখবেন যেন!' ভবেশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো উপদেশ দিল। তারপর বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরাও আজকাল পৌরাণিক আর সামাজিক বাদ দিয়ে আর কোনও প্লে ধরছি না। আজ টাউন ক্লাবে ভাল ফুটবল ম্যাচ আছে। দেখবেন?'

খেলাধুলো নিয়ে বৃন্দাবনের বিশেষ আগ্রহ নেই। তিনি তাই বললেন, 'বিকেলে ভাবছি গজু মল্লিকের সঙ্গে দেখা করব। শুনেছি মুন্সিপালিটিতে ওঁর হাত আছে। রায়বাহাদুর খেতাবের তালিকাতেও নাম আছে শুনলাম।'

'এরা হল ইংরেজদের স্তাবক, বুঝলেন?' নাক কুঁচকে বলল ভবেশ, 'বঙ্কিমদার ব্যাপারে সাহায্য চাইতে গেলাম, কী বলল জানেন?'

'বঙ্কিমদা কে?'

'পুলিশের নাক ফাটিয়ে ফেরার হয়েছে।' বেশ তৃপ্তির সুরে বলল ভবেশ। তারপর একটু চমকে উঠে বলল, 'আরে! সরোজেন্দ্রবাবু যে!'

ভবেশের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফিরিয়ে বৃন্দাবন দেখলেন, একটি চমৎকার গদি-আঁটা, হুড লাগানো ঘোড়ার গাড়ি আর্য নাট্যের বাড়িটার দিকে যাচ্ছে। সেটা থামামাত্র গাড়ির পিছনে দাঁড়ানো লোকটা এক লাফে নেমে দরজা খুলে দিল। গাড়ি থেমে নামলেন একজন সৌম্যদর্শন মানুষ। চওড়া পাড়ের মিহি ধুতি, গায়ে ততোধিক মিহি সোনার বোতাম লাগানো পাঞ্জাবি, হাতে আভিজাত্যের প্রতীকস্বরূপ হাতির দাঁতের মাথাওয়ালা লাঠি।

'আমাদের অর্কেস্ট্রার ডিরেক্টর।' কথাটা উচ্চারণ করে ছুটল ভবেশ।

'নতুন পালার সুরটা সক্কাল সক্কাল মাথায় এসে গেল, বুঝলে। ওদের একবার খবর দাও তো। বেঁচু তো বাড়িতেই থাকে এ সময়। তবলাটা পেলেই হবে। হারমনিয়াম আমি নিয়ে এসেছি।'

গোটা শহর খুঁজলে দশ-বারোটার বেশি হারমনিয়াম বার হবে কি না সন্দেহ। দামি জিনিস। আর্য নাট্যের নিজস্ব হারমনিয়াম আছে অবশ্য। কিন্তু নিজেরটা ছাড়া তৃপ্তি পান না সরোজেন্দ্র দেব রায়কত। সে হারমনিয়াম এখন সাবধানে গাড়ি থেকে নামিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

গুটিগুটি পায়ে বৃন্দাবনও এসে দাঁড়ালেন সরোজেন্দ্রর সামনে। তাঁর দিকে এক পলক তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আগে দেখিচি কি?'

'আজ্ঞে না।'

'গানবাজনা করা হয়?'

'আজ্ঞে থিয়েটারে শখ আছে।'

'আছে?' তিনি খুশি হলেন, 'শোনো তো সুরটা। কেদার ভেঙে আজ সকালেই পেলাম।'

হাতে তালি দিয়ে তাল মিলিয়ে শিশুর মতো উৎসাহে তিনি গাইতে লাগলেন— ডা-ডা-ডা-রা, রা-ডা-রা-আ। বৃন্দাবন অবাক হয়ে দেখতে লাগল সেই গাওয়া। আকাশে মেঘ ভেঙে হালকা রোদ্দুর ফুটেছে, করলা থেকে ভেসে আসছে ছলছল শব্দ। এদিকটায় কোলাহল প্রায় নেই বললেই চলে। সামনের গাছ থেকে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে তাল মেলানো তালির সংগতে সুরসমন্বিত অর্থহীন ডা-রা ধ্বনি আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল বৃন্দাবনের মন। তাঁর সুরবোধ আছে। সহজ অথচ প্রাণবন্ত এক ছন্দোময় সুর তাঁকে মুগ্ধ করে দিচ্ছিল।

'সেতারের গত। তারপর ফ্লুট আসবে।'

হঠাৎ গাওয়া থামিয়ে কথাগুলো বলে ভিতরে চলে গেলেন সরোজেন্দ্র দেব রায়কত। বৃন্দাবন শুনল, ভবেশ মুগ্ধ সুরে বলছে, 'আপনি গানও বোঝেন দাদা! আপনার তো থিয়েটারের ফিউচার খুব ব্রাইট!'

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

জেনে-শুনে বিষ করেছি পান

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স

সাগরিকা রায়

ডুয়ার্সের বিয়েবাড়ির গল্প হচ্ছিল, মনে আছে? সেই যে মেয়েটাকে ঠকিয়ে বিয়ে করেছিল একটা লোক! মেয়েটা লোকটার স্বরূপ বুঝে পালিয়ে বাবার কাছে চলে এসেছিল। ভারী দুঃখের এবং মর্মান্তিক ঘটনা। সবসময় কি আর এমন হয়? শুভবিবাহ শুভই হয়ে থাকে। উঠোন আছে সব বাড়িতেই। ধুয়ে-মুছে রাখা হয়েছে তাকে। বসার জায়গা হয়েছে লম্বা করে আসন পেতে। কলাপাতায় খাওয়ার ব্যবস্থা। মেনু একই রকম। মানে, প্রথমেই মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, বাঁধাকপির ঘণ্ট বা আলু-পটোলের ডালনা, রুই মাছ ভাজা, রুই মাছের ঝোল, পাঁঠা বা খাসির মাংস, দই, রসগোল্লা, চাটনি। এখনকার মতো রাধাবল্লভি, নান, চপ... ক্যাটারার... বাবা! তখনকার ডুয়ার্স এসব কল্পনাই করেনি। পারতই না ভাবতে! পঁয়ষট্টি টুকরো মাছের পিস বা আশিখানা রসগোল্লা খেয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাঁদের স্টেটাস ছিল, তাঁরা দমে গেলেন ক্যাটারার নামক জীবের নাম শুনে। মনে আছে, বাগচি বাড়িতে উপনয়ন উপলক্ষে ডুয়ার্সের এক অঞ্চলে এল ক্যাটারার। খাদ্যরসিকরা বিমর্ষ— ধুর, এক পিস মাছ এনে 'দেব দেব?' করাটা আমাদের পোষাবে না। তবে সে ভয় থাকলেও ক্যাটারার নামক দ্বিপদের নিয়ম মেনে পরিবেশনের ফলে হজমের গোলমাল হল না। বলা ভাল, কিছুটা আটকাল। এটা ঠিক। শেষ পর্যন্ত এই শব্দটা ডুয়ার্সে এখন বহুল প্রচলিত। ক্যাটারিং ব্যবসা এখন ডুয়ার্সে জমিয়ে বসেছে। এক বৃদ্ধা মহিলা শব্দটাকে নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছিলেন। নাতির অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন করতে স্বয়ং বেরিয়েছিলেন— আমার ছেলে বলেছে, নাতির অন্নপ্রাশনে ক্যাটালালকে ডাকবে। সে নাকি ভারী ভাল রাঁধে। একা হাতে সব করে। রাঁধো রে, কাটো রে, পরিবেশন করো রে... সব। টাকা নেবে ভালই। তা নেবে না-ই বা কেন? এত গুণ যে একটা মানুষের মধ্যে থাকতে পারে, ভাবা যায়? সে কি মানুষ? ভগবানের নিজের হাতে বানানো।

সেবার কী হল, চা-বাগানে বিয়ে। সুদৃশ্য তোরণদ্বার তৈরি। কেবল দ্বার তৈরি করাই নয়। তোরণের দু'পাশে দু'জন কিশোরী স্ট্যাচু হয়ে রইল। বাকিরা গোলাপ ও গোলাপজল নিয়ে অপেক্ষমাণ। বর এল। বিয়ে শুরু হল। হাসি, গল্প, গান... কিছুই বাকি নেই। ভালভাবেই মিটে গেল বিয়ে। অসুবিধা হল বাসি বিয়ের দিন। দিনটা শুরু হয়েছিল হাসি দিয়েই। তবুও তারই মধ্যে কে আবিষ্কার করে ফেলল, ছেলের গোত্র মেয়ের গোত্রের থেকে নিম্নমানের! চলে এল জাত-বেজাতের প্রশ্ন। এ কী? সম্বন্ধ ঠিক করার সময় এই প্রশ্নটাই করা হয়নি? ছেলে জাতে উঠল। কিন্তু মেয়ে? তার যে সব গেল! এককালে নাটক করতেন পাত্রীর এক আত্মীয়া। সব দেখে-শুনে চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিলেন— এ কী শুনছি! আমার যে শরীর চলছে না! এ বিয়ে হবে কী করে? অন্যান্যরা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। জাত-ধর্ম খোয়ানোর কষ্ট কি কম? কেন কনেপক্ষকে ঠকানো হল? এর চে' মেয়েকে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দিতাম! হায় ভগবান!

সব দায় ভগবানের ঘাড়ে দিয়ে হাঁপ ছাড়লেই কি হবে? তবে হুল্লোড় যা হল তা দেখে অন্যেরা কী বলে চুপ থাকতে পারে? তাদেরও দায়িত্ব বাড়ল কান্নাকাটি বা সংলাপের দৃশ্যে অংশগ্রহণ করতে। অসুবিধা হল, এই নাটকে কোনও পরিচালক ছিল না। যার যেমন ইচ্ছে, সে তেমনই সংলাপ বলে

গেল। আসলে উপস্থিতির স্বাক্ষর রেখে গেল। বরপক্ষের এক বয়স্কা মহিলা অবস্থা সামাল দিতে এগিয়ে এলেন— দেখুন, এখন কেউ গোত্র-টোত্র নিয়ে মাথা ঘামায় না। মেয়ে-জামাই ভাল থাকে যদি... !

—তা বললে তো আপনাদের ভূমিকাটা পালটে যাচ্ছে না। আপনাদের গোত্র আগে বলেননি কেন?

—আপনারা জিজ্ঞেস করেননি কেন?

—বাঃ, দোষ হল আমাদের। পাগলের কথা!

—আমি কেন পাগল হব? আপনি পাগল। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, অ্যাসাইলামে ছিলেন।

ব্যাস! শেষ সংলাপটুকু পাশের ঘরের বড় জামাইয়ের কানে গেল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন— সেঁসল্লিশ নম্বর বেড়ে।

ঘরভেদী বিভীষণ। ধরো তাকে। এই, তুমি কি টাকা খেয়েছ নাকি ওদের থেকে?

অবস্থা এতটাই গভীরে পৌঁছাল যে, নিমন্ত্রিত অতিথিরা তড়িঘড়ি বাড়ি ফেরার আয়োজন করলেন। এরই মধ্যে সময় হল বর-কনেকে বিদায় জানানোর। কাঁদতে কাঁদতে কনে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরতে চেঁচিয়ে উঠল— ওরে, আমাকে ওখানে পাঠাস না রে। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!

এর ঠিক চার দিন পরের কথা। দ্বিরাগমনে ফিরে এসেছে ওরা। লাল শাড়ি, নতুন ভ্যানিটি ব্যাগ, শাঁখা-সিঁদুরে গয়নায় ঝলমলে কনে পড়শির কানে কানে গুপ্ত খবর দেয়— যাও না, শোনো গিয়ে, জামাই কেমন সুন্দর গান গায়!

বলেছিলাম কিনা, ডুয়ার্সের বাতাস বড় মধুময়!

ডুয়ার্সের কোনও কোনও অঞ্চলে বউভাত হয় দিনের বেলা। অর্থাৎ মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ! ঝামেলা (?)-টামেলাগুলো 'দিনাদিনি' সেরে রেস্ট নেওয়া যেতে পারে। তখন বহুদিন ধরে যত্নে শেখা অতুলপ্রসাদিটা গেয়ে ফেলতে পারে কনে। বরও এই ফাঁকে রোমান্সের ফাঁকফোকরগুলো ফিল-আপ করতে করতে 'ভালবাসার তুমি কী জানো?' গেয়ে ফেলে। সেবার রানুর বরকে ধরা হল— গান জানো?

—আরে না না!

—বাথরুম সংগীত?

—অই একটু একটু, হে হে! প্রভাবশালী শালিদের সামনে বলশালী বরও হালে পানি পান না। বিপাকে পড়লেও সালিশি করার কেউ থাকে না তার পাশে। অগত্যা কাঁপা এবং ফ্যাঁসফেঁসে গলায় গান ধরতে হয়— 'আমি জেনে-শুনে বিষ করেছি পান।'

রাত হয়ে গিয়েছে অনেক। ফিরে আসছি। বরযাত্রী যেতে হয়েছিল জলপাইগুড়িতে। গভীর রাত কাকে বলে, সেটা এখন বোঝা যায় না, কিন্তু তখন বেশ বোঝা যেত। নিশুতি রাতে গাড়ির হেডলাইট থেকে বিচ্ছুরিত আলো অন্ধকার ঠেলে ঠেলে এগচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে প্রাচীন সব মহীরুহ। ক্রমশ যেন আদিম যুগে ফিরে যাচ্ছি।

বেশ ওজনদার ভদ্রলোক। শরীরেও, পকেটেও। তাঁর একটা শখ ছিল। ছোট ছোট আলু দিয়ে দম খেতে খুব ভালবাসতেন তিনি। তাঁর বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার অনুষ্ঠান মানেই সবার পাতে ধুমধাম করে আলুর দম পড়বে। পিঠে নয়। পেটে। পড়তে হবেই। না হলে তিনি রাগ করেন। সুতরাং আমড়া আঁটি মুখ করে খাও বসে আলুর দম। ঝাল হলেও উফ, আঃ করবে না। তাহলে উনি রাগ...।

—বড্ড ভয় করছে আমার! কে যেন ফিসফিস করে গাড়ির মধ্যে। ভয় যে করছে, সে কথা অস্বীকার করি কী করে? ডাকাতি হতে পারে। নির্জন রাস্তায় ডাকাতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বলতে বলতে দু'জন লোক মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। চেঁচাল— রোকো!

—মাথা খারাপ? এ সময়ে কেউ রোকে?

—আরে রোকো ভাই, হামারা গাড়ি খারাপ হো গয়া। ওরা চেঁচাল ফের। অন্ধকারের ভিতরে একটা গাড়ির অবয়ব দেখা যাচ্ছে আবছা। অসীম সাহসে ভর করে গাড়ি থামাল ড্রাইভার— কেয়া হুয়া?

—বারাত জানা থা। লেকিন পেট্রোল খতম হো গয়া। মানে বরযাত্রী যাবে বলে এখানে আটকে আছে।

—কেয়া করেগা? কাঁহা মিলেগা পেট্রোল, বোলিয়ে? ইহাঁ পর তো কোই গাড়ি ভি রুকতা নেহি!

ইসলামপুর থেকে এসেছে। যাবে আলিপুরদুয়ার। গাড়ির পিছনে ফুল-টুল রয়েছে দেখা যাচ্ছে। তো এত রাত হয়েছে। খানা-টানা খেয়েছ কিছু? তাহলে আমাদের কাছে খাবার আছে। মিঠাই। নিতে পারো।

—খানা খায়া জি। আমাদের থেকে পেট্রোল নিতে আসে ওদের ড্রাইভার।

বেচারা! কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছাবে! তারপর খাওয়াদাওয়া। কিন্তু এখান থেকে আলিপুরদুয়ার পৌঁছাতে কম করে এক ঘণ্টা। কে বসে থাকবে খানা নিয়ে ওদের জন্য?

খানাপিনার কথায় মনে পড়ল, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। কতরকম রান্না হয়েছে আজ! সেসব হয়ত এদের ভোগে লাগল না।

খাবারদাবারের কথায় এক ভদ্রলোককে মনে পড়ে গেল। বেশ ওজনদার ভদ্রলোক। শরীরেও, পকেটেও। তাঁর একটা শখ ছিল। ছোট ছোট আলু দিয়ে দম খেতে খুব ভালবাসতেন তিনি। তাঁর বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার অনুষ্ঠান মানেই সবার পাতে ধুমধাম করে আলুর দম পড়বে। পিঠে নয়। পেটে। পড়তে হবেই। না হলে তিনি রাগ করেন। সুতরাং আমড়া আঁটি মুখ করে খাও বসে আলুর দম। ঝাল হলেও উফ, আঃ করবে না। তাহলে উনি রাগ...। নিজের পছন্দের ধাক্কা দিয়েছিলেন আরেক ভদ্রলোক। তিনি ডাল ভালবাসেন। তা তিনি বাসতে পারেন। ডাল, পালা, মূল, কাণ্ড... সব তিনি ভালবাসুন, আপত্তি নেই। কিন্তু নিজের পছন্দ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কোনও মানে হয়? ছেলের বউভাতে পাড়া-বেপাড়া ঝেঁটিয়ে নেমন্তন্ন করেছেন। খাওয়ার জায়গা হয়েছে মাঠে প্যান্ডেল বেঁধে। স্কুল থেকে প্রচুর বেঞ্চ নেওয়া হয়েছে। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পরিবেশনকারীরা। ভদ্রলোক নিমন্ত্রিতদের উদ্দেশে হাত জোড় করলেন— গরিবের বাড়িতে লজ্জা করে খাবেন না। নিজের বাড়ি মনে করে... ইত্যাদি। সকলে হেসে ঘাড় নাড়ল— তা আর বলতে? মাংস হয়েছে শুনেছি। আর কী চাই দাদা?

কিন্তু পরিবেশনকারীদের প্রথম চারজনের হাতেই ভাতের বালতি। তারা সোৎসাহে ভাত দিয়ে যেতে থাকল। পরের চারজনের হাতে মুগ ডালের বালতি। তারা ছুটে এল ডাল নিয়ে। এবারে মসুর ডাল এল। এবারে ক্রমে ক্রমে ছোলা, খেসারি, অড়হর, মটর, কলাই...। পুরো ডাল সিজন। ঘোষবাবু বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়লেন। ডাক্তার দত্ত খেপে গুড়ুম— মশাই, একেবারে ডাল ব্রেন আপনার। আপনাকে পুলিশে দিতে হয়। ছবিবাবুর মেয়ের বিয়েতে সাংঘাতিক খাওয়ানো হবে। সেটা রাতে। তাহলে দুপুরের খাওয়ায় একটু ডালই হোক। হালকা খাওয়াই ভাল। রাতে নাকি ইলিশ হবে। ডাল দিয়ে খেতে খেতে আলোচনা চলছে— সঙ্গে চিংড়িও। দু'রকমের মাংস। সুপসাপ। ইচ্ছেমতো মিষ্টি। সুপসাপ। ডাল চলছে আলোচনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ডাল যে এত সুস্বাদু, সে দিন বোঝা গিয়েছে।

স্কেচ: দেবরাজ কর

মারণগিরির ওপর দাঁড়িয়ে চড়ুইভাতি!

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অগস্ট ভিসুভিয়াসে অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংস হয়ে যায় সার্নাস নদী তীরের পম্পেই নগরী। সেখানে শেষ দিন অ্যাম্পিথিয়েটারে খেলা দেখাতে আনা হয়েছিল একটি বাঘ ও একটি সিংহকে। ভাবা হয়েছিল, তারা আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দেবে পরস্পরকে। কিন্তু তারা সে দিন লড়তে চায়নি। কোনও এক আতঙ্কের পূর্বাভাস পেয়ে তারা সেদিন শান্ত।

বলা হয়, ইতিহাস নিজেকে অনুকরণ করে। সত্যিই কি তাই? ইতিহাসের পম্পেইয়ের সঙ্গে ঘটমান বর্তমানের ছবিটা মিলিয়ে দেখলে অবশ্য তা খানিকটা আঁচ করা যায়। একদা আইসিস মন্দিরে জনতা টাকা রেখে আশীর্বাধন্য হত। বাণিজ্যে রওনা হওয়ার আগে বণিকরা সেখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা দান করে দেবীর বরাভয় চাইতেন। কোথায় দেবী? আইসিসের নামে জমা হওয়া ধনরত্ন হাতিয়ে নিত আর্বাসেস নামে এক ধূর্ত মিশরীয়। জনমানসে আইসিসকে জাগ্রত করে তোলার বিভিন্ন ফন্দিফিকির ছিল তার ব্রেনচাইল্ড। সত্যিই তো, আমাদের চারপাশে এমন ধূর্ত মানুষরূপী শয়তান কি কিছু কম আছে? মুখ তুলে চাইলে কি এমন অসংখ্য আর্বাসেস দেখতে পাই না সমাজে?

মৌতাতের উপকরণ তখনও ছিল। পম্পেই শহরে তৈরি বিভিন্ন মদ বিখ্যাত। সেগুলো যেত রোমে। অগ্ন্যুৎপাতের আগে উর্বর জমিতে গম, যব, বার্লি ও হরেক দানাশস্যে সবুজ হয়ে থাকত মাটি। কৃষিই ছিল পম্পেইয়ের ভিত্তি, ভূমিকম্প ভবিষ্যৎ। একালে যেমন দেখি, সেকালেও ছিল বখরার জন্য লড়াই করা মাস্তান সব মল্লযোদ্ধা। সেখানে কখনও তরুণ বীর লাইদন ছুরি হাতে হারিয়ে দেয় অভিজ্ঞ গ্ল্যাডিয়েটর তেত্রাইদিসকে, কখনও নাইজারের হাতে ধরা লোহার জালে বন্দি হয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা। লড়াইয়ে জিতে এরা টাকা পায় ঠিকই কিন্তু তার চেয়েও দ্বিগুণ মুনাফা করে পম্পেইয়ের অভিজাতরা। তারা এক-এক জন মল্লকে নিয়ে বাজি ধরে। ছবিটা চেনা চেনা লাগছে না?

পম্পেইয়ের ভূমিকম্পের কারণ ছিল আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠা। যে ভিসুভিয়াসকে সবাই জানে শান্ত, সেখানে আচমকা আগ্নেয় বিস্ফোরণ। রোমান সভ্যতায় বীর নায়কেরা ছিলেন। পম্পেইয়ের শেষ দিনে মিসেনাম শহরে বই পড়তে পড়তে রোমান নৌবহরের সেনাপতি 'প্লিনি দ্য এল্ডার' দেখতে পেলেন আকাশে ধোঁয়ার কুন্ডলী। একটু বাদে ভিসুভিয়াসের পাদদেশ থেকে এক মহিলার চিঠি, বাঁচান। প্লিনি সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ নিয়ে এগলেন। আকাশে ঘন ছাই, অপরাহ্নেই অন্ধকার। নদীতে গলিত লাভার স্রোত। ক'জনকে বাঁচিয়ে সেনাপতি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে।

ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক এডওয়ার্ড বুলওয়ার লিটন-এর 'দ্য লাস্ট ডেজ অফ পম্পেই'-এর নায়ক গ্লকাস সেই শহরে আসার পথে দেখেছিল জীর্ণ মিনার্ভা মন্দির। লোকে মদ্যপান, বাজি ধরা, মল্লযুদ্ধ, হৈ চৈ নিয়ে মেতে থাকে। জ্ঞানের দেবীকে পাত্তা দেয় না। পম্পেই যুগে দার্শনিক সেনেকা থেকে কবি লুসান, অনেকেই তখন সম্রাট নিরোর কাছের লোক। অব্যবস্থিতচিত্ত সম্রাট অবশ্য পরে দু'জনকেই আত্মহত্যার নির্দেশ দেন। দার্শনিক

সেনেকা তাই সটান বলেছিলেন, 'তরবারি কাউকে খুন করতে পারে না। সে খুনির হাতের অস্ত্র'।

কিছুদিন আগে গাজোলডোবায় গিয়েছিলাম। দেখতে পাওয়া গেল তিস্তার মূল খাত শুকনো, নানা রঙের বালির বিস্তার, কিছু বালিয়াড়িও দেখা যাচ্ছে। তিস্তার জল ব্যারাজ থেকে তিস্তা ক্যানাল দিয়ে বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে ক্যানালের ওপরে একটা পাখিও উড়তে দেখা গেল না। তার বাঁধানো পাড়ে বিদেশি ঝাউ গাছ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৃষ্টিচ্ছায় অরণ্য দিয়ে যে নদী নেমে এসেছে, তাকে বাঁধানো ক্যানালের দৃষ্টিশোভন ঝাউ গাছের সারি দিয়ে

সাজানো হয়েছে। টুরিস্ট স্পট হিসেবে জায়গাটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য তিস্তার জল থেকে আলাদা করে পুকুর খোঁড়া হয়েছে। সেখানে বোটিং হবে। হোটেলগুলোর জন্য জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু টুরিজম মানেই যে বানানো লেকে বানানো নৌকাবিহার নয় সেটা কবে বুঝব আমরা? পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক নদীকে উপেক্ষা করে তার পাশে পুকুর খোঁড়া হয়েছে। প্রকৃতিকে সংহার করার সাজা কি প্রকৃতিই আমাদের ফিরিয়ে দেবে না একদিন?

দু'দিনের জন্য ঘুরতে গিয়েছিলাম দার্জিলিং লাগোয়া ছবির মতো পাহাড়ি গ্রাম লামাহাটায়। সেখানে হোম স্টে-তে এক রাত্তির থেকে পরদিন যাওয়া হল লেপচা জগৎ ও আরও কিছু মন ভাল করা পাহাড়ি জায়গায়। খবরের কাগজ কিনেছিলাম রাস্তায়। সেখানে একটা খবরে চোখ আটকে গেল। সেখানে বলা হয়েছে দার্জিলিঙের সবুজ পাহাড় আর নির্মল বাতাসের সুখস্মৃতি ঘুচতে চলেছে। অন্তত তেমনটাই আশংকা করছেন আবহবিদরা। তাঁরা বলছেন, দার্জিলিং পাহাড় ও সুন্দরবনের পরিবেশ দূষণের মাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। এই প্রথম পাহাড়ে ও জঙ্গলে বাতাসে দূষণের মাত্রা ধরা পড়ায় চিন্তার ভাঁজ দেখা গিয়েছে পরিবেশপ্রেমীদের মধ্যে।

পাহাড়ে ও সুন্দরবনে এই পরিবেশ দূষণের জন্য পরিবেশ বিজ্ঞানীরা দায়ী করেছেন বিহার ও উত্তরভারতের শিল্পাঞ্চল থেকে নির্গত দূষিত বায়ুকে। সম্প্রতি বোস ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এই দূষণ ধরা পড়েছে। ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন পাহাড়ের পরিবেশ রক্ষা করার জন্য আন্দোল শুরু করেছে। কয়েক মাস ধরে দার্জিলিং ও সুন্দরবনের পরিবেশের ওপর নজর রাখছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিজ্ঞানীরা। এজন্য দার্জিলিং ও সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে অথলোমিটারস নামে অত্যাধুনিক যন্ত্র বসান তাঁরা। এই যন্ত্রে সংগৃহীত নমুনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাঁরা।

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও উত্তরবঙ্গের পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলোর মতে দার্জিলিং পাহাড় এলাকায় প্রতি কিউবিক মিটার বাতাসে ৩.৫ মাইক্রোগ্রাম কালো কার্বনের উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। সুন্দরবনে এই পরিমাণ ১৫ মাইক্রোগ্রাম। একই সঙ্গে এই কার্বনের উৎস পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে এর বেশিরভাগই উত্তর ভারত ও বিহারের শিল্পাঞ্চল থেকে আসছে। ঘণ্টায় ২০ কিমি বেগে উত্তর ভারত থেকে এই কার্বনযুক্ত বাতাস এই রাজ্যে প্রবেশ করে।
উত্তর-পশ্চিমি মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বছরে কয়েকবার কার্বনযুক্ত বায়ু দার্জিলিং ও সুন্দরবনে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সবুজের ওপর কার্বনের প্রভাবে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাতাসের এই দূষণ সাধারণ মানুষের

শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর প্রভাব ফেলছে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলো থেকে আসা এই দূষিত বায়ুর মাধ্যমে এই রাজ্যের বাতাস ক্রমে বিষাক্ত হয়ে পড়ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের পরিবেশবিদরা।

গত দশ বছর ধরে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির অন্তত পঁচিশ হাজার দূষিত অটোর বিষাক্ত ধোঁয়া এই অঞ্চলের বাতাসকে ভয়ানকভাবে দূষিত করেছে। এই এনজেপি এলাকাতেই প্রতিদিন ছয় হাজারের মতো অটো চলাচল করছে। এনজেপি স্টেশনের অন্তত পঁচিশ হাজার যাত্রী অটোর ধোঁয়ার দূষণে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। গোটা স্টেশন এলাকা কালো পিচে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার সবুজ গাছ নিধন করে ডিজেল চালিত গাড়ির স্ট্যান্ড বানানো হয়েছে। সেখান থেকে ঠিকাদাররা পার্কিং ফি আদায় করছেন। ডিজেল দূষণ ও প্রখর রোদে যাত্রীরা, রেল স্টেশনের ব্যবসায়ীরা জেরবার হচ্ছেন।

ভারত প্যারিস জলহাওয়া সম্মেলনে গিয়ে বায়ুমন্ডলে কার্বন নিঃসরণ অন্তত ৩০ শতাংশ কমিয়ে আনবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কীভাবে কার্বন নিঃসরণ কমবে? প্যারিস জলহাওয়া সম্মেলনের প্রতিশ্রুতি রাখতে রাজ্যস্তরের প্রশাসনকে গ্রিন সোলার এনার্জির ওপর ভীষণ জোর দিতে হবে। নইলে

মন্ট্রিল প্রোটোকলের মতো প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন চুক্তিও কথার কথাই থেকে যাবে।

মাঝেমধ্যেই গুজব ওড়ে, পৃথিবী একটি বিশেষ তারিখে ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই তারিখ পার হয়ে যায়। পৃথিবী টিকে থাকে, তার লয় হয় না। তবে নটে গাছটিও কিন্তু মুড়োয় না। সত্যি বলতে, ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা যাই বলুন এই গ্রহটি যে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে সেটা অতীতের ভবিষ্যৎদ্রষ্টার কেতাবে লেখা নেই। লেখা আছে ঘটমান বর্তমানের অগণিত সংকেতে।

গ্রিনল্যান্ডের বরফপৃষ্ঠের ৯৭ শতাংশ গলে গিয়েছিল কিছুকাল আগে। আর্কটিক সমুদ্রের বরফ রেকর্ড পরিমাণ কমে গিয়েছিল। তা একেবারে গলে যেতে পারে কয়েক বছরের মধ্যে। বিশ্ব উষ্ণায়ন হল তার কারণ। এই বিশ্ব উষ্ণায়ন নিবারণের জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনা কত জরুরি সেটা এখন আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ধনী দেশগুলো সেই দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। অনেকের মতে, এ ব্যাপারে বিশেষ করে অসহযোগী হল আমেরিকা। তারা কিয়োটো প্রোটোকল অনুমোদন করেনি। অর্থাৎ নিজেদের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা বেঁধে দেওয়ার দায়বদ্ধতা

> দশ বছর ধরে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির অন্তত পঁচিশ হাজার দূষিত অটোর বিষাক্ত ধোঁয়া এই অঞ্চলের বাতাসকে ভয়ানকভাবে দূষিত করেছে। এই এনজেপি এলাকাতেই প্রতিদিন ছয় হাজারের মতো অটো চলাচল করছে। এনজেপি স্টেশনের অন্তত পঁচিশ হাজার যাত্রী অটোর ধোঁয়ার দূষণে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। গোটা স্টেশন এলাকা কালো পিচে মুড়ে দেওয়া হয়েছে।

স্বীকার করেনি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দরিদ্র দেশগুলোর যে সমস্যা হচ্ছে ও হবে তার মোকাবিলায় তাদের কতটা আর্থিক সাহায্য করবে সে ব্যাপারেও ওয়াশিংটনের কাছে কোনও নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। তাদের এই ধরি মাছ না ছুঁই পানি মনোভাব সতিই দুর্ভাগ্যজনক।

গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে তেল, গ্যাস ও কয়লার মতো জীবাশ্ম-জ্বালানি পোড়ানোর। ফলে, এই শিল্পগুলো চায় না, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার জন্য জ্বালানি ব্যবহারের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হোক। এখনও আমেরিকা যদি গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে গরজ না করে তাহলে পৃথিবীর কাছে আমেরিকার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠবে না। বছরে একটি করে জলবায়ু সম্মেলন করে লাভ নেই যদি না বড় বড় দেশগুলো কাজের কাজটি করে।

পম্পেইয়ের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম এই লেখা। ৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অগস্ট যা ঘটেছিল তা আমরা ভুলিনি। ভিসুভিয়াস থেকে নির্গত আগুনে লাভায় গলে গিয়েছিল সার্নাস নদী তীরের পম্পেই নগরী। ঠিক সে যুগের মতোই আমরাও ভয়ংকর এক আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে চড়ুইভাতি করছি। কখন গলিত লাভার স্রোত বেরিয়ে আসবে, আকাশ ঢেকে দেবে ছাই দিয়ে আমরা কেউ জানি না। পাহাড়চুড়ায় দাঁড়িয়ে পিকনিক করতে করতেই একদিন আমরা দেখব, হিমালয়ের একটি প্লেট আর একটি প্লেটের নিচে ঢুকে গিয়ে পাহাড় সমেত আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

পাঠকের দরবার

সীমান্তের চিঠি

এ যেন অনেকটা শাঁখের করাতের মতো— যেতেও কাটে, আবার আসতেও কাটে। এমনই অবস্থা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া। সীমান্তে বেড়া থাকলেও সমস্যা, আর না থাকলে আরও বেশি সমস্যা। অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান বন্ধের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ও সীমান্ত সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এর পর পর্যায়ক্রমে সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে ১৫০ গজ বাদ দিয়ে এই কাঁটাতারের বেড়া ও সীমান্ত সড়ক তৈরি করা হয়েছে। কোচবিহার জেলার তিনদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত। তুফানগঞ্জের বালাভূত থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৫০০ কিলোমিটার সীমান্ত। সারা পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহার সীমান্তেও এই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থা কিংবা অন্যান্য নানা কারণে এখনও জেলার সর্বত্র এই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়নি। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে সীমান্ত বরাবর যে ভারতীয় ভূখণ্ড রয়েছে, সেই জমিগুলি উর্বর। অথচ নানা কারণে ওই জমির একটা ব্যাপক অংশে চাষ-আবাদ হচ্ছে না। সঠিকভাবে বলতে গেলে, কৃষকরা ওই জমিতে চাষ-আবাদ করছেন না। ফলে প্রচুর জমি পতিত পড়ে রয়েছে। এর কারণ বিবিধ—

প্রথমত, সীমান্তে যে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হয়েছে, বেড়ার ১ কিলোমিটার পরপর রয়েছে গেট। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যাঁদের জমি, তাঁদের বেশির ভাগ কৃষকের বাড়িঘর কাঁটাতারের বেড়ার এপারে। কাঁটাতারের বেড়ার যে গেটগুলি রয়েছে, সেই গেটগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সীমান্তের বিএসএফ। কাজেই বিএসএফের মর্জিমাফিক গেটগুলি খোলা হয়। তা ছাড়া সার, বীজ কিংবা কৃষি সরঞ্জাম নিয়ে গেট দিয়ে পারাপারের সময় অনেক সময় সীমান্তবাসীদের সন্দেহের চোখে দেখে। ফলে কাঁটাতারের ওপারের জমিতে চাষবাস করতে কৃষকদের অনীহার সৃষ্টি হচ্ছে। এ

ছাড়াও কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যাঁরা বসবাস করে থাকেন, যাঁদের জমি ওপারেই রয়েছে, তাঁদের যেমন এপার থেকে কৃষি সরঞ্জাম নিয়ে যেতে সমস্যা, তেমনি উৎপাদিত ফসল কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে এপারের কোনও হাটে কিংবা বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সমস্যা। কারণ, বিএসএফ-কে যেভাবে জবাবদিহি করতে হয়, তাতে কৃষকের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

দ্বিতীয়ত, ওপারে যে কৃষিজমিগুলি রয়েছে, সেখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। ফলে সেচব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি। ফলে ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে যে পরিকাঠামো থাকা দরকার, সেই পরিকাঠামো নেই। তাই ওইসব জমি চাষের ক্ষেত্রে কৃষকদের অনীহা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

তৃতীয়ত, সীমান্তে নজরদারির স্বার্থে মাঝেমধ্যেই বিএসএফের তরফ থেকে কৃষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়, সীমান্তের জমিগুলিতে পাট, ভুট্টা আর যেসব ফসল লম্বা হয়, সেসব ফসল চাষ করা চলবে না।

চতুর্থত, অনেক সময় দেখা যায়, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে জমি থেকে ফসল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা কেটে নিয়ে চলে যায়।

এমন নানা কারণে কৃষকরা কাঁটাতারের ওপারের জমিগুলিতে চাষবাস করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন ক্রমশ। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যেসব এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া হয়েছে, সেখানকার কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের জমির শতকরা ১০ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ জমি অনাবাদি পড়ে থাকছে। দিনহাটার নাজিরহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামগঞ্জ সীমান্তে ১ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যে জমি রয়েছে, তার ১০ শতাংশ জমি অনাবাদি পড়ে রয়েছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সৈদাখ সীমান্তে ২ কিলোমিটার বেড়া দেওয়া হয়েছে। সেখানে শতকরা ৩০ ভাগ জমি অনাবাদি পড়ে রয়েছে। চৌধুরিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত লোকার জায়গির বালাবাড়ি-১ গ্রামের ১ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। বেড়ার ওপারের ভারতীয় ভুখণ্ডের শতকরা ২০ ভাগ জমি অনাবাদি হয়ে রয়েছে। এভাবে অনাবাদি জমি দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচি, মাথাভাঙা, হলদিবাড়ি—কমবেশি সর্বত্রই রয়েছে। হিসেব ধরলে এই জমির পরিমাণ নেহাত কম নয়। এই জমিতে চাষবাস না হওয়াতে কোচবিহার জেলার উৎপাদিত মোট ফসলের পরিমাণের উপর প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক।

এবার আসা যাক সীমান্তে চোরাচালান প্রসঙ্গে। কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আন্তর্জাতিক পাচারকারীরা হাল

কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আন্তর্জাতিক পাচারকারীরা হাল আমলে আরও বেশি সক্রিয়। পাচারকাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অনেকটাই বেড়েছে। যেসব এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে, সেসব এলাকায় পাচার বন্ধ না হলেও কাঁটাতারবিহীন এলাকাগুলিকে প্রধানত করিডর হিসেবে বেছে নেয় পাচারকারীরা। সীমান্তের পাচারকারীরা যেমন বাংলাদেশের চোরাকারবারিদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলে, তেমনি এ দেশের ভিন রাজ্যগুলির সঙ্গেও তাদের নেটওয়ার্ক রয়েছে।

আমলে আরও বেশি সক্রিয়। পাচারকাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অনেকটাই বেড়েছে। যেসব এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে, সেসব এলাকায় পাচার বন্ধ না হলেও কাঁটাতারবিহীন এলাকাগুলিকে প্রধানত করিডর হিসেবে বেছে নেয় পাচারকারীরা। বিশেষ করে নদীবিধৌত এলাকায় ভূপ্রাকৃতিক কারণে এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। সীমান্তের পাচারকারীরা যেমন বাংলাদেশের চোরাকারবারিদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলে, তেমনি এ দেশের ভিন রাজ্যগুলির সঙ্গেও তাদের নেটওয়ার্ক রয়েছে। এ দেশ থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্রের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পাচার হয় গবাদি পশু। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি ভিন রাজ্য থেকে গোরু ক্রয় করে রীতিমতো গাড়ি করে সীমান্তে আনা হয়। সেগুলি সুযোগ বুঝে বাংলাদেশে পাচার করা হয়। কখনও সেগুলি কেটে মাংস করে পাচারের খবরও মেলে। তবে যেসব এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে, সেখানে এভাবেই পাচার হয়ে থাকে। তবে গোরুর পরিবর্তে বাংলাদেশ থেকে প্রধানত আসে সোনা। পাচারের সময় পাচারকারীদের হাতে থাকে অস্ত্র। গ্রামবাসীরা কিংবা সীমান্তের বিএসএফ এদের বাধা দিতে গেলে তা মোকাবিলার জন্যে তৈরি থাকে পাচারকারীরা। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের সঙ্গে পাচারকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা হরহামেশাই ঘটে থাকে। এমনকি রাতের অন্ধকারে কাঁটাতারের বেড়া কেটে গোরু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র পাচারের ঘটনার খবর মাঝেমধ্যেই মেলে। পাচারের কাজ সচল রাখার জন্য পাচারকারীরা বাংলাদেশ ও ভারতীয় উভয় দেশেরই সিম কার্ড ব্যবহার করে থাকে।

এদিকে, অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান বন্ধে সীমান্তের মানুষকে শামিল করার লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা নিয়েছে বিএসএফ। বিএসএফের উদ্যোগে শুরু হয়েছে সিভিল অ্যাকশন প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের আওতায় সীমান্ত এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলো ও শিক্ষার সরঞ্জাম প্রদান ছাড়াও সীমান্তের যুবক-যুবতীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে, যাতে সীমান্তের তারা বিএসএফ তথা আধা-সামরিক বাহিনী কিংবা সামরিক বাহিনীতে চাকরির সুযোগ পেতে পারে।

তা সত্ত্বেও বিএসএফের নানা ফতোয়ায় বিএসএফের সঙ্গে সীমান্তের মানুষের সম্পর্ক কতটা হৃদ্যতার, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। সীমান্তের এপার-ওপার নাগরিক মঞ্চের সভাপতি হরিপদ মণ্ডলের অভিমত, সীমান্তের বিএসএফের নানা ফতোয়ায় সীমান্তের মানুষের মধ্যে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিএসএফের জন্যেই সীমান্তে বারবার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। সীমান্তের মানুষ তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে।

সীমান্তের সমস্যা মোকাবিলায় সীমান্তের সাধারণ মানুষ ও অভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, সীমান্তে যে কাঁটাতারের বেড়ার গেটগুলি রয়েছে, সেগুলি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা রাখা হোক, যাতে সীমান্তের মানুষ কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের জমিগুলিতে সঠিকভাবে চাষ-আবাদ করতে পারেন।

এখানে যেসব এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়নি, সেখানে সীমান্তের জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হোক। সীমান্তের মানুষ যাতে সরকারি কোনও পরিচয়পত্র দেখিয়ে অবাধে চলাচল করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করা হোক। অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রোধে বিএসএফ-কে আরও কঠোর হতে হবে। পরিশেষে যে বিষয়টি জরুরি তা হল, বিএসএফের সঙ্গে সীমান্তের মানুষের সম্পর্ককে অরও সুদৃঢ় করতে হবে। এমনটাই মনে করেন অভিজ্ঞ মহল।

হরিপদ রায়, দিনহাটা

খুচরো ডুয়ার্স

অ্যাঁ !

হাজারো অনুষ্ঠানের সঞ্চালক, কবি, টাউনের শতবর্ষ পার হওয়া নাট্যদলের পরিচালক, দূরদর্শনের শিল্পী। এক কথায় বহুগুণান্বিত ব্যক্তি বললে মোটেই ভুল হয় না। তা এমন প্রতিভা নিশ্চয়ই ‘বঙ্গভূষণ’ পাওয়ার তালিকায় আছেন, নইলে উল্লেখ করছি কেন! আরে দাদা, তাহলে তো মিটেই যেত। কিন্তু আমরা এহেন প্রতিভার নামোল্লেখ করছি বিলকুল অন্য কারণে। আসলে এই সে দিন জলপাইগুড়ি থেকে তিনি সিআইডি-র হাতে গ্রেপ্তার হলেন কিনা! তবে কি তিনি সরকার বিরোধী নাটক লিখে গ্রেপ্তার হলেন? ধুস! তা কেন হবে! তাঁকে যে শিশু পাচারের কারণে পাকড়ানো হয়েছে গো! বলিস কী কাকা! এ যে জ্যান্ত নাটক শোনাচ্ছিস! ব্যাটা বুদ্ধিজীবী সেজে পাচার করে বেড়াচ্ছিল তার মানে! কী কাণ্ড! তবে সংশোধনাগারে

আজকাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেখানে এমন প্রতিভার দরকার বলে গ্রেপ্তার করেনি তো?

জেমস বন্ডালু

কোচবিহারে আলুর বন্ড চাষিদের বদলে কীভাবে ফড়েদের হাতে ফড়ফড়াচ্ছে তা নিয়ে বেজায় গুজগুজ-ফিসফিস! হিমেল মাথায় ফন্দি এঁটেই নাকি হিমঘরের মালিকরা বন্ড তুলে দিচ্ছেন ফড়েবাবুদের করতলে। বন্ড রহস্যে মালিকদের কারা অক্সিজেন জোগাচ্ছে তা জানতে গেলে নাকি জেমস বন্ড মার্কা শিহরন বেরিয়ে আসতে পারে। আর বেচারা আলু চাষিদের দেখো! বেচতে গিয়ে কিলোপিছু তিনটে টাকাও পুরো মিলছে না। ব্যাপার এমন জটিল যে, কৃষক সংগঠনের শাসক শাখার সদস্যরাই আন্দোলনে নেমে পড়েছিল সেখানে। অতঃপর অবস্থার উন্নতি ঘটেছে কি না জানা যাচ্ছে না। তবে ফি-বছর ডুয়ার্সে আলুর বন্ড বিলি নিয়ে যে জেমস বন্ড মার্কা উত্তেজনা তৈরি হয়, তাতে শেষ পর্যন্ত ফড়েরাই হাসে। সে আলুর কিলো তিন হোক কি তিরিশ। তাই তো কবি লিখেছিলেন, ‘বধূ কোন আলু লাগল চোখে’।

মেলা মিটিং

সবাই জানে, ডুয়ার্স থেকে বিনা পাসপোর্টে ফি-বছর হাজারো গোরু সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে চলে যায়। তবে কেউ যদি ভেবে থাকেন যে গোচালান অতি সহজ কর্ম, তবে বেজায় ভুল ভাবছেন। এর জন্য চালানকারীদের গুচ্ছের মিটিং করতে হয়, ফন্দি আঁটতে হয়। তারপর আছে দরদাম ঠিক করা। সব মিলিয়ে হাজারো মিটিং না করলে গোরুরা পথ ভুলে বাংলাদেশ ভেবে বিএসএফের তাঁবুতে ঢুকে পড়তে পারে। সে দিন শুনলেম, সেইসব জরুরি গোমিটিং করার জন্য সদস্যরা নাকি মেলা-উৎসব-কীর্তনের আসর বেশি পছন্দ করছেন। হাজারো লোকের মাঝে জিলিপি খেয়ে, গান শুনে, নাগরদোলায় চেপে সেরে নিচ্ছেন দরকারি আলোচনা। ফলে তাঁদের পিছু নেওয়া গুপ্তচররা পড়েছেন ভারী ফ্যাসাদে। রাস্তাঘাট, দোকান-বাজার হলে না-হয় সামলানো যায়, কিন্তু মেলার ভিড়ে নজরদারি চালানো কি সোজা কথা রে বাপ!

কুকুরভাতি

জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া ৭৩ মোড়ে সে দিন স্থানীয় নেড়িদের জন্য জোর পিকনিকের

আয়োজন করেছিলেন কতিপয় ব্যবসায়ী। এমনিতে রোজ পথনেড়িরা মিডডে মিল হিসেবে রুটি-বিস্কুট পেয়ে থাকে লোকজনের কাছ থেকে। কিন্তু বাড়ির পোষা আদুরে ডগিদের মতো তাদেরও তো ভালমন্দ খেতে ইচ্ছে হয়। তাই পিকনিক। মেনু ভাত আর মুরগির মাংস। গোড়ার দিকে পিকনিকের ব্যাপারে নেড়িরা কিঞ্চিৎ উদাসীন থাকলেও বেলা বাড়তেই দলে দলে যোগ দিয়েছে। ফলে পিকনিক সফল। তবে মাংস-ভাত ভরতি কাগজের প্লেট পাওয়ার পর নেড়িদের সিংহভাগ ভাতের দিকে ফিরেও তাকায়নি— এটাই যা দুঃখ।

নকলালংকার

মানে নকলকারীদের মধ্যে অলংকারস্বরূপ। পরীক্ষায় চোথা করার কাজে মোবাইল ফোনের উপযোগিতা টের পাওয়ার পর আজকাল পরীক্ষার হলে সে বস্তু নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই হোয়াট্‌সঅ্যাপাস্ত্র ভোঁতা। তা সত্ত্বেও সেই অ্যাপ থেকে দিব্যি টুকলি ডাউনলোড করছিল এক ছোকরা। মাধ্যমিকে অঙ্কের দিন। গোড়ায় টের না পেলেও ঘণ্টাখানেক বাদে পাহারাদার টিচারের সন্দেহ হয় ছোকরার আচরণে। হাতে ঘড়ি পরেছে ভাল কথা, কিন্তু হরেক কায়দায় মিনিটে মিনিটে ঘড়ি দেখার কী আছে বাপু! অতঃপর খপাৎ এবং তারপর কাণ্ড জেনে চোখ কপালে! এ তো ঘড়ি ঘড়ি নয়, ফোন নিশ্চয়! ঘড়ি-ফোন দিয়ে নকলের অভিনব বুদ্ধি দেখার পর ছোকরাকে ‘নকলালংকার’ উপাধি কেন দেওয়া হবে না তা একবার বলবেন স্যার?

সুধরবাবুর চাপ

লাটাগুড়ি লাগোয়া ছাওয়াফেলি জুনিয়র হাই স্কুলের সুধরবাবু ক'দিন দশভুজ হয়ে কাটালেন। এমনিতে তিনি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। কিন্তু মাধ্যমিক শুরু হতেই স্কুলের তিন শিক্ষকের সবাই গেলেন ইনভিজিলেটরের ডিউটি দিতে এবং সুধরবাবু পড়লেন অনন্ত চাপে। একাই ঘণ্টা বাজিয়ে, ক্লাস শুরু করিয়ে, নাম ডেকে, পড়া ধরে, মিডডে মিল তদারকি করে, ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে রীতিমতো অস্থির হওয়ার জো! ভাগ্যিস দু'দিন পর গস্মেন্টের লোক তিন টিচারের একজনকে স্কুলে থাকার নির্দেশ দিয়ে শেষাবধি সুধরবাবুর চাপ কমিয়েছিল! জানা গেল, মেটেলি ব্লকে ইনভিজিলেটর বাড়ন্ত থাকার কারণেই এই কাণ্ড! হায়! এখানেও 'বাড়ন্ত'!!

যাচ্ছেতাই

মাত্র পঞ্চাশ কি বাহান্নজন, তবুও মিলেমিশে থাকার ইচ্ছে নেইকো! নিত্যদিন গোলমাল লেগেই রয়েছে। আজ এর বউ নিয়ে সে পালাচ্ছে তো পরদিন এর গার্লফ্রেন্ড টাটা দিয়ে চলে যাচ্ছে ওর সঙ্গে! রোজ রোজ মারপিট-রক্তপাত। কেউ কেউ ভাগাপত্নীক হয়ে মনের দুঃখে এলাকা ছেড়ে দোপেয়েদের এলাকায় হামলা করে ফ্রাস্ট্রেশন দূর করছে। সব দেখে কর্তাদের ঘুম লাটে। এত সুন্দর ঘাসভরা জঙ্গল, টলটলে জল পাওয়ার পরেও কেন রে এত পরকীয়াপ্রীতি? না-হয় মানলাম তোরা সব গন্ডার। কর্তারা তোদের সবাইকে বউ এনে দিতে পারেনি। তা বলে রোজ রোজ এই অশান্তি করবি? সত্যি! তোরা না সব যাচ্ছেতাই!

এবার চালা

আলিপুরদুয়ারের পথে পাবলিকের কেউ কেউ এমন গাড়ি চালাচ্ছে যে, গতি দেখে আলো পর্যন্ত লজ্জিত! এইসব কক্ষচ্যুত ধূমকেতুকে নিয়ে আম পাবলিক তো বটেই, কর্তা পাবলিকেরও টেনশনের শেষ ছিল না। প্রচুর বুঝিয়েও কাজ হচ্ছিল না দেখে এবার প্রশাসন ঠিক করে ফেলেছে, রাস্তায় লেজার গান বসিয়ে গাড়ির গতি মাপবে। তারপর থানায় ধরে এনে নিউটনের গতিসূত্র বোঝাবে। কথায় কথায় পথচারীদের ঘেবড়ে দিয়ে, সারমেয়দের টেনশন বাড়িয়ে, উল্কার পিঠে চড়ে, ট্রাফিককে কলা দেখিয়ে হাওয়া খাওয়ার দিন এবার শেষ হল বলে আলিপুরদুয়ারে। এবার চালা দিকি কেমন পারিস!

মেখলিনামা

এ ভারী অজিব সমস্যা রে ভাই! মেখলিগঞ্জের ইংরিজি বানানটা ঠিক কী? যে যার মতো লিখে যাচ্ছে দেখে বেজায় মন খারাপ এলাকাবাসীর। না-হয় কারা জানি বঙ্গজীবনের অঙ্গ থেকে ইংরিজি অলংকার খুলে দিয়েছিল ঐতিহাসিক মিসটেকের কারণে। জলে না ভিজিয়ে ইংরিজি পড়তে-লিখতে না-হয় খাবি খায় আম শিক্ষিতজন। তা-ই বলে একটা জায়গার নাম পাঁচজনে পাঁচরকম লিখবি কেন রে? গস্মেন্টের লোক অবশ্যি বলছে যে, তারা বলে 'মেকলি'। সে না-হয় মানা গেল, কিন্তু ভোটের খাতায় তবে গস্মেন্ট কেন 'মেখলি' লেখে? শুধু কি তা-ই? কে জানি পেল্লায় হোর্ডিং লাগিয়ে লিখেছে 'মেথলি'। কে লিখেছে হে? শেকসপিয়রের প্রাইভেট টিউটর নাকি?

ক্রিকেট তোলা

ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হবে, সে তো ভারী ভাল কথা। কিন্তু সে কারণে পাবলিকের কাছ থেকে চাঁদার নাম করে তোলা আদায় ভারী বিচ্ছিরি জিনিস! তদুপরি তোলা না পেয়ে তিন তিন বস্তা সুপুরি লুঠ! এ তো দেখি মগের মুলুক হে! ব্যাট-বলের নামে ফালাকাটায় কারা জানি কয়েকদিন যাচ্ছেতাই মস্তানি করে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ক্লিন বোল্ড হল। গন্ডাখানেক উদ্যোক্তা সুপুরির

বস্তা সমেত 'আউট' হয়ে ফিরে গিয়েছে শ্রীঘর নামক ড্রেসিং রুমে। বাকি খেলোয়াড়রা ভ্যানিশ। ক্রিকেটের নামে তোলা আদায়ের এই কীর্তি জানার পর এলাকার পাবলিক বলশালী বোলারের মতো অপেক্ষা করে আছে বাউন্সার দিয়ে তোলাবাহিনীকে 'রিটায়ার্ড হার্ট' করানোর জন্য।

টুক্রাণু

পৌঁছাবার রাস্তা ছাড়া স-ব আছে মেটেলির খামারে। ডুয়ার্সে এবার চিতা বাঘ গোনা হবে। গত এক পক্ষে আরও আধ ডজন দোপেয়ে হাতির আদরে আহত। কালিম্পঙে গুরুংবাবুকে টাটা দিয়ে ঘাসফুলে হাঁটা রাশি রাশি কর্মীর। কড়া গার্ড দেওয়ার অপরাধে চোপড়ায় স্কুল ভাঙচুর পরীক্ষার্থীদের। জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের রাতভর জলসায় কানে ভোঁ ভোঁ এলাকাবাসীর। মামিকে নিয়ে পলায়ন হেতু রায়গঞ্জে গ্রেপ্তার ভাগনে। এক গাড়ি মদ ফেলে চালকের চম্পট ডালখোলায়। রামঝোরা চা-বাগানের তিনশোর বেশি চা গাছ পুড়ে ছাই। আবার, আবার এবং আবার জালি দু'হাজারি নোটোদ্ধার মালদায়।

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-৬। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-13 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.